যুগাচার্য বিবেকানন্দ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

প্রকাশক—শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী. ৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩ এবং শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
৮ বি, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬
মণীন্দ্র প্রেস হইতে মুদ্রিত।

—আমার স্বর্গত মাতৃদেবীর

পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে—

সূচী

মুর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বলভাস্করমিষ্টমমরনরবন্দ্যম্ ।
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিতগর্হিতকাঞ্চনকামিনীবন্ধম্ ।

যিনি সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান, দেব ও মানব
উভয়েরই পূজনীয়, কোন ঐশ্বর্য, কোন
বাসনা যাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি—
সেই বেদান্ত-বিগ্রহ
মূর্ত মহেশ্বরকে প্রণাম করি, পুনঃ পুনঃ
প্রণাম করি ।

*　　*　　*　　*

ভুক্তিমুক্তিকৃপাকটাক্ষাপেক্ষণমঘদলবিদলনদক্ষম্ ।
বালচন্দ্রধরমিন্দুবান্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দম্ ।

ভোগ ও মোক্ষ যাঁর কৃপাকটাক্ষ মাত্রের
অপেক্ষা রাখে, সকল পাপ ও
মালিন্য যিনি মুহূর্তে মুছে দিতে সক্ষম—
শিব-স্বরূপ ও সর্বথা-
পূজনীয় সেই শ্রীগুরু বিবেকানন্দকে প্রণাম করি,
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণাম করি ।

*　　*　　*　　*

আমাদের নিবেদন

ক্রান্তদর্শী মহা-মনীষা স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্ম-জয়ন্তীর পুণ্যলগ্নে তাঁর অক্ষয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে এই স্বল্লায়তন গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের যা নিবেদন ছিল—আজও তাই রইল। সেদিন বলেছিলাম:

একদিন বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর আবির্ভাব-সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন গভীর সমাধিমগ্নতার মধ্য-দিয়ে—

সেদিন অকস্মাৎ,
শ্রীগুরু দেখিল, বিশ্ব-নিখিল
ভরিয়া উঠিল জ্যোতিতে।
স্বর্গের শেষে, ঋভুগণ দেশে
মহাঋষি সমাধিতে।....

তারপর সে সমাধি থেকে তিনি স্বয়ং, সনির্বন্ধ অনুনয়ে সমস্যা-জর্জর এ পৃথিবীতে তাঁকে আনয়ন করেছিলেন, শিবরূপে জীবসেবার মহান আদর্শ সংস্থাপিত করবার জন্য, বনের বেদান্তকে আমাদের গৃহে, আমাদের প্রাত্যহিকতার প্রয়োজনে নিয়োজিত করবার জন্য।

সে এক বিচিত্র কাহিনী, বিচিত্র আখ্যায়িকা।

আজ বিংশ-শতাব্দীর আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতা নানা দিক থেকে, নানাভাবে ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করছে, জাতীয় দৌর্বল্যের হেতু বলে কঠিন ভাষায় ধিক্কার দিতে চাইছে।... সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই যুগে সে চ্যালেঞ্জকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, ধর্মকে কি ভাষায় সংজ্ঞিত করেছিলেন, মানবের জীবনদর্শনটিকে কোন্ ভিত্তিতে গড়তে

চেয়েছিলেন বিদগ্ধ সমাজের কাছে আজকের বিশেষ সন্ধিক্ষণে, তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে এ-গ্রন্থে বিনম্র অন্তরে আমরা প্রয়াসী হয়েছি। সে প্রয়াস কতটা সার্থক হয়েছে বলতে পারি না।

*　*　*　*

এ কথা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শ্রমিকতন্ত্র প্রভৃতি কোন রাজনৈতিক মতবাদই দেশকে যথার্থ কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়। সেজন্য প্রয়োজন মানুষের। স্বামীজীর ভাষায়—'আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ' মানুষের। তেমন মানুষের উদ্ভব যদি দেশে না হয় তবে দেশ বড় হবে না, বাঁচবে না। আর বর্ত্তমান যুগে স্বামীজীই সে-কথা কঠিন আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে দ্বিধাহীন-কণ্ঠে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, মানুষ তৈরীই আমার একমাত্র কাজ,—

Man making is my only task...

এ স্মারক-গ্রন্থে স্বামীজীর সে অক্ষয় বাণীটিই আমরা পুনর্বার দেশের সম্মুখে তুলে ধরলাম।

আমাদের অকুণ্ঠ প্রার্থনা,—আমাদের জীবনে ও কর্মে তাঁর পুণ্য আবির্ভাব সার্থক হোক, পূর্ণ হোক। আমাদের প্রয়াসে ও ধ্যানে বীর্য এবং মহত্ত্ব, নম্রতা এবং অকপটতা রূপায়িত হোক। ইতি—

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ সাল।

'সারদাপুরী'
মাখলা, হুগলী

শ্রীভাসরঞ্জন রায়

প্রস্তাবনা

অন্তহীন জ্যোতির মন্দিরে,
সমরস অখণ্ডের ঘরে
ছিলে সমাধিতে, তুমি ঋষিবর।
জ্যোতির্ময় দেবশিশু, তোমা সেথা হতে
বহুশ্রমে আনিল জগতে, ঘোষি' কালান্তর

*   *   *   *

ধ্যানসিদ্ধ তুমি মহাপ্রাণ,
প্রাচিরের নব সমাগান,
কহিলেন যুগের দেবতা,— অকুণ্ঠ ভাষণে।

তব ধ্বনি, তব প্রেম-গাথা,
কণ্ঠে নিতি আশার বারতা—
দুঃখ-নত শুনিল ধরণী—অশ্রুত শ্রবণে।

'বহুরূপে ঘিরেছে তোমারে,
তারে ছাড়ি কোন্ দেবতারে
কোন্ সে ঈশ্বরে, কর আরাধনা ?

বৃথা মন্ত্র, বৃথা স্তব-গান,
তীর্থ বৃথা, বৃথা গঙ্গাস্নান।
যত্র জীব, তত্র শিব—এই মন্ত্রে জানিও সাধনা'

'এ মহান যুগবাণী,
তব কণ্ঠে উচ্ছ্বসিল ধ্বনি--
প্রকাশিল সত্যের মহিমা—বিচিত্র ব্যঞ্জনা।

'মানুষ, মানুষ হোক,'—
এই ছিল একক স্বপন
নিত্যমুক্ত তোমার পরানে, হে মহাজীবন।

ভগ্নদেহ তপস্থার ভারে,
দ্বিধাহীন সত্য আবিষ্কারে—
হল তাহে মন্ত্রের স্ফুরণ—প্রেম, প্রেম এই মাত্র ধন

আজি তব শত-বার্ষিকীতে,
শ্রদ্ধায় আনত চিতে
রাখিলাম সাষ্টাঙ্গ প্রণতি, পূর্ণের আহুতি।
তুমি দেব দিও ললাটিকা,
জীবনের জ্বালি দীপশিখা
দ্বিধাহীন করি যেন নিতি—সত্যের আরতি।

———



(I) ভালবেসে দেশ, সন্ন্যাসীবেশ
আপন অঙ্গে ধরিল।



(II) শ্রীগুরু দেখিল, বিশ্বনিখিল
ভরিয়া উঠিল জ্যোতিতে

এক

কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বের কথা।

বাংলায় তখন উনবিংশ শতাব্দী।

সেই পুণ্যশতাব্দীর বিপুল সম্ভাবনাময় ষষ্ঠ দশকে বাংলার মাটিতে যে বিরাট পুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন বাংলার হৃৎপদ্মসম্ভব হয়ে,—ভারতবর্ষের লুপ্ত-গৌরব যিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের সম্মুখে···

তমসাচ্ছন্ন, আত্মবিস্মৃত জাতিকে যে পুরুষ-সিংহ মর্মান্তিক আঘাতে জাগ্রত করেছিলেন আত্মচেতনা, কর্মসাধনা ও সেবাধর্মের মধ্যে···

সেই সিংহবীর্য, হৃদিবান্ মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের অনবদ্য জীবনকথা আজ সংক্ষেপে বাংলার সমস্যা-পীড়িত সমাজের সম্মুখে আমরা উপস্থিত করছি। এ তাঁর বিস্তৃত জীবনকাহিনী নয়, বিশদ বা আনুপূর্বিক কোন ইতিহাসও নয়। এ শুধু, 'গঙ্গাপূজি গঙ্গাজলে'র মত অতি তুচ্ছ ও অক্ষম একটি চিত্র রচনা, এ শুধু এক বিরাট যুগজীবনের অনুধ্যানে নিজের একান্ত অকিঞ্চিৎকর জীবনকে পবিত্র করবার, ধন্য করবার ক্ষীণ প্রচেষ্টা মাত্র।

তার বিস্তৃত ও বিচিত্র জীবনকাহিনী পাঠ করলে, অনুধ্যানে উপলব্ধি করে অনুসরণ করতে চেষ্টা করলে কল্যাণ হবে দেশের, কল্যাণ হবে জাতির। সঙ্কট-সঙ্কুল জীবনপথে নির্ভয়ে এগিয়ে যাবার অভ্রান্ত নির্দেশ

না জেনেও অমিত-সাহসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পুত্রের প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেবার।

বস্তুত, সংজ্ঞাহীন মায়ের দেহটিকে যখন জল থেকে বহুকষ্টে, বহুশ্রমে উদ্ধার করা হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল যে পুত্রের একটি হাত অতি দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ধরে আছেন। প্রচণ্ড জলস্রোত কোনমতেই সে বজ্রমুষ্টি শিথিল করতে পারেনি, পুত্রকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়নি।

উত্তর জীবনে বিশ্বনাথ এটর্ণি হয়েছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টে।

যেমন অগাধ অর্থ উপার্জন করতেন তেমনি দরাজহস্তে খরচ করতেন। কার্পণ্য ছিল না, কুণ্ঠাবোধ ছিল না। বলতেন, পুত্র-কন্যাদের যথার্থ শিক্ষা দেওয়াই পিতা মাতার কাজ, তাদের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে রাখা নয়।···

আত্মীয়-স্বজনে, বন্ধু-বান্ধবে, আশ্রিত-পরিজনে সর্বদা তাঁর গৃহ পূর্ণ থাকত। থাকত উৎসব-মুখর। এক কথায়, মহামজলিসি লোক ছিলেন বিশ্বনাথ।

হাফেজের কবিতার মধ্যে থেকে রস গ্রহণ করতে চেষ্টা করতেন, সুফী কবিরাও তার পরম প্রিয় ছিল।

নিজে সুকণ্ঠ ছিলেন এবং সঙ্গীতচর্চার দিকে তাঁরে বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাইবেল পুরাণ তাঁর আদরের নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ ছিল।··· বলতেন, ধর্মবস্তু যদি কোথাও কিছু থাকে তবে ঐ সব গ্রন্থের মধ্যেই আছে, অন্যত্র কিছু নেই।

স্বাধীনচেতা, উদার-হৃদয় ও আনন্দময় পুরুষ বিশ্বনাথ—বাইরে সংসারী হলেও অন্তরে অনাসক্ত ছিলেন, বহুলাংশে মুক্ত ছিলেন।

মাতা ভুবনেশ্বরী। সদা প্রফুল্ল কিন্তু শান্ত ও সংযতবাক,—মাতৃত্বের ও মাধুর্যের অপূর্বপ্রকাশে মহিমময়ী। স্মৃতিশক্তিতে তিনি অসামান্যা, রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকা বিবৃতিতে অতুলনীয়া।

বৃহৎ পরিবারের সবাই, এমন কি প্রতিবেশী সকল নরনারীও তাঁর স্নিগ্ধ মাতৃত্ব ও অনতিক্রম্য ব্যক্তিত্বের কাছে সানন্দে মাথা নত করে থাকত। তাঁকে একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলে ভাবত, সুখ-দুঃখের সমভাগী বলে মনে কবত।

সদাশিব স্বামীর স্বচ্ছল, বিপুল সংসারে তিনি সর্বময়ী ছিলেন, অধীশ্বরী ছিলেন। তবু কিন্তু অন্তরে বেদনা ছিল, তীব্র অভাববোধ ছিল একটি। তিন-চারটি তাঁর কন্যা, কিন্তু তিনি পুত্রহীনা।

বাঞ্ছিত পুত্রকামনায় অন্তর তাই পিপাসিত ছিল, চঞ্চল ছিল। কাশী বিশ্বনাথের পাদমূলে নিত্য প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করতেন, অন্ততঃ একটি বংশ-গৌরব পুত্রলাভের জন্য। কালে সার্থক হয়েছিল সে তপস্যা, তুষ্ট হয়েছিলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন,—

আমি তব ঘরে, পুত্ররূপ ধরে
জনমিব শোন মাতা।
গৃহে ফিরে যাও, দুঃখ নাহি পাও—
ধ্রুব জেনো মোর কথা।

* * * * *

এখন থেকে একশত বৎসরেরও পূর্বেকার কথা আমরা বলছি। গল্প নয়, উপকথা নয়…ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, সুস্পষ্ট মসিচিত্রে অঙ্কিত বাস্তব-কাহিনী। ধরিত্রীর-বুকে জন্ম নিয়েছিলেন—তপস্যাতুষ্ট বীরেশ্বর—বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরীর পুত্ররূপে।

ডাকনাম তাই রাখা হয়েছিল 'বীরেশ্বর'। সংক্ষেপে মুখে মুখে দাঁড়িয়েছিল 'বিলে'।

বীরেশ্বর তাই, ডাকিল সবাই
মুখে মুখে কহে 'বিলে'।
বাংলার বুকে, শত-বর্ষ আগে—
শিশুরূপে জনমিলে।...

এরপর পোষাকি নাম হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ।

উত্তরকালে জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন, অমর হয়েছিলেন আর একটি নামে। সে নাম শোনেনি এমন বাঙালী কেউ নেই, এমন ভারতবাসী কেউ নেই। সে-নাম স্বামী বিবেকানন্দ, অথবা শুধুই স্বামীজী।

অনিন্দ্যসুন্দর, সুঠাম, তেজস্বী বালক—যোগীর চক্ষু নিয়ে, শঙ্করের মেধা আর বুদ্ধের হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন সংসারে, জন্মেছিলেন সুরধুনীর তীরে আমাদেরই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমে, ইংরাজী ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারী, সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রত্যুষ-প্রাক্কালে। সে কথা পূর্বে বলেছি। সেদিন নবোদিত সূর্যের সহস্র স্বর্ণরশ্মিতে, খরবাহিনী গঙ্গার কলধ্বনিতে, প্রভাতপাখির মুখর কলকাকলিতে সে জন্মবার্তা দশদিকে বিঘোষিত হয়েছিল।

'...সম্ভবামি যুগে যুগে'।

দুরন্ত দুর্জয় সাহস, অফুরন্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য ও নিষ্কলুষ সরলতা বালকের শৈশব-জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। আবার, অতি শৈশবেই সমবয়সীদের নিয়ে চক্রাকারে সে 'ধ্যান', 'ধ্যান' খেলতে বসত। সে-সব খেলায় এক বিচিত্র দৃশ্য প্রতিভাত হত। দেখা যেত, অন্য ছেলেরা দু-চার মিনিটেই চঞ্চল হয়ে উঠছে, উস্‌খুস্ করছে। 'বিলে'

কিন্তু তন্ময় হয়ে যেত, মুহূর্তে কোন্ চিন্তা-গভীরতায় যেন মগ্ন হয়ে যেত, ডুবে যেত। বিষধর সাপ পাশ দিয়ে গেলেও তার হুঁস হত না, ধ্যান ভাঙ্গত না। এমনি ধর্মসংস্কার, এমনি ধ্যান-পরায়ণতা—তার শৈশব জীবনের অপরিণত অবস্থার দিনগুলিতেই সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হত।

মায়ের কোলের কাছটিতে শুয়ে শুয়ে রামায়ণ মহাভারতের পুণ্য-কাহিনী, পুবাণ-ভাগবতের গল্পগাথা শুনতে শুনতে বালক তন্ময় হয়ে যেত। বর্তমানের আবেষ্টনী অতিক্রম করে দূব অতীতের কল্পলোকে মুহূর্তে তার কিশোর মন যেন উধাও হয়ে ছুটে যেত। কথকতায় ও যাত্রাগানে রামভক্ত হনুমান অমর বলে জানতে পেরে, সরল বিশ্বাসে বালক দিনের পব দিন কলাবাগানে, আমবাগানে বসে থাকত মহাবীর হনুমানের তিলেকের দর্শন লাভের আশা নিয়ে, তার সঙ্গে বাক্যালাপ করবার অভিলাষ নিয়ে। মহাকাব্যের এ বীরচরিত্রটির প্রতি একটি ঐকান্তিক অনুরাগ বালকেব উত্তরজীবনে, এমন কি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত, অক্ষয় ছিল।…

আবার কুস্তিতে, লাঠিখেলায়, জিম্‌নাষ্টিকেও সে ডানপিটে ছিল, দলের সর্দাব ছিল। ধর্মসাধনাব আদিতে শবীরসাধনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সে যেন স্বতঃই ধরে নিয়েছিল।

স্কুলের বই যত পড়ুক আর নাই পড়ুক, বাইরের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের গ্রন্থাদি পড়ে জ্ঞান আহরণের ঝোঁক তার প্রচণ্ড ছিল শৈশব থেকেই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা যেন শত বিচিত্রমুখে প্রকাশিত হতে সুরু করেছিল সে কাল থেকেই। এই বিচিত্র বিশ্বে নিরবধিকাল কত জ্ঞান-সম্পদ বহন করে নিয়ে চলেছে পরমানন্দ অভিমুখে।…আমি সেই সম্পদ আহরণ করব, জগৎকে জানব, জীবনকে বুঝব, পরাজ্ঞান লাভ করব,—যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই মাটি, কাঠ ও পাথরের জগতের অন্তরালে অন্য অতিন্দ্রীয় কোন জগৎ থেকে

থাকে তবে সে জগতের রহস্য আমি উদ্ঘাটন করব—এমি সঙ্কল্প সংস্কারগতভাবেই যেন তাঁর শৈশব জীবনকে উৎকণ্ঠিত করেছিল, চঞ্চল করে তুলেছিল।

কথিত আছে, এই সময় প্রতি রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্নে ও কল্পনায় মিশিয়ে ভাবী জীবনের একটি অদ্ভুত চিত্র দেখতে পেত সে। চেষ্টা করে নয়, কোন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে নয়। অমনি, স্বতঃই ছায়াছবির মত চিত্রগুলি ভেসে আসত চোখের সামনে—ঘুম আসবার ঠিক প্রাক্ মুহূর্তটিতে।

একবার দেখত…সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে রিক্তহস্তে সে গৃহত্যাগ করেছে শঙ্করের মত, বুদ্ধের মত। এই বিশাল বিশ্বে সে এক রমতা সাধু। চলমান জলস্রোতের মত, প্রবাহমান বায়ুর মত। মুক্ত ও স্বাধীন।

আবার দেখত,…অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে বিপুল মান মর্যাদা ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সংসারে। খ্যাতি ও কীর্তিতে সে অদ্বিতীয়। তার সমতুল্য কেউ নেই, সমকক্ষ কেউ নেই।

মুহূর্তে দু'টি ছবিই আবার মিলিয়ে যেত।

তারপর ভিতর থেকে কে যেন অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করত প্রশ্ন। এ দুটোই হবার শক্তি আছে তোর ভিতর, ভেবে দেখ, কোন্‌টা হবি।

ধীরে স্বপ্নের অবাস্তব ছায়াছবি মিলিয়ে যেত, আর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হবার কল্পনাটিই যেন তার কিশোর মনকে আচ্ছন্ন করত, চেতনাকে আবৃত করে দিত।
বালক ঘুমিয়ে পড়ত।

একদিন নয়, ছু'দিন নয়, প্রায় রোজই সে এ দৃশ্য দেখেছিল… শৈশবের অনেকদিন ধরে। তার বিরাট ভাবীজীবনের এক অর্থময় ইঙ্গিত এমনি করে দীর্ঘ যাত্রাপথের উদয়-লগ্নেই নির্দেশ করেছিলেন তার ভাগ্যবিধাতা। তাছাড়াও হয়ত অদৃশ্য আহ্বান ছিল দেশ-মাতৃকার, আহ্বান ছিল বিশ্বব্যাপ্ত এক নূতন জীবন-জিজ্ঞাসার।

নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, সেই সময়, সন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে…একবার পিতার তদানীন্তন কর্মস্থল মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামক স্থানে পরিবারস্থ মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার ভার পেয়েছিল সে। রেললাইন তখনো সে সব অঞ্চলে খোলা হয় নি। সে জন্য নাগপুরের পর থেকে দীর্ঘ পথ তাদের গো-শকটে অতিক্রম করতে হয়েছিল প্রায় সপ্তাহকাল ধরে।

নিসর্গের বিচিত্র-সৌন্দর্যমণ্ডিত একান্ত নির্জন সে ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে নরেন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতসারেই এক অতল গভীর চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করেছিল সে-সময়। আরাবল্লী পর্বতমালার সানুদেশে দিগন্ত-বিস্তৃত বনভূমির মধ্যদিয়ে জনহীন সে-পথরেখাটি বিসর্পিত ছিল। চতুর্দিকে স্তব্ধ, গম্ভীর, নিবিড় বনানী আর তারই পশ্চাতে স্তরবিন্যস্ত শৈলমালা, কতযুগ মন্বন্তর ধরে তারা মহাকালের মহাযাত্রার সাক্ষ্য বহন করছে। বিরাটের চিন্তায় নিয়ত-নিযুক্ত অরণ্য-প্রকৃতির সে এক বিচিত্র ধ্যান-তন্ময়তা, এক অবর্ণনীয় গম্ভীর মহিমা।

তারই মধ্যে সহসা একদিন এক সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়ে অগ্রসর হবার সময় পথিপার্শ্বস্থ উত্তুঙ্গ পর্বতের গাত্র-ফাটল-বিলম্বিত এক বিশাল মধুচক্র নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্রকৃতির নিভৃত নিরালায়, সর্ববিশালতার মাঝখানে মধুমক্ষিকাদের সে অপূর্ব চক্ররচনা, সে বিচিত্র সৃষ্টি এক অনাস্বাদিতপূর্ব ভাবে তন্ময় করেছিল, অভিভূত করেছিল নরেন্দ্রনাথকে।

বিশ্বনিয়ন্তার অপার মাহাত্ম্যের চিন্তায় সে এককালে বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছিল দীর্ঘ সময়ের জন্য।

তাঁর জীবন-চরিতকারগণ বলেন প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানরাজ্যে প্রবেশ করে একেবারে বাহ্যসংজ্ঞা হারিয়ে ফেলা সেই তার জীবনে প্রথম ঘটেছিল।...

এই যেমন একদিক, অন্যদিকে আবার আর্তের সেবার জন্য, দুঃস্থের দুঃখ দূর করবার জন্য, যুবশক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে উচ্চ আদর্শ ও মহৎ লক্ষ্যে চালিত করবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় সঙ্ঘ স্থাপনেও তৎপর ছিল নরেন্দ্রনাথ কিশোর বয়স থেকেই। দেহটিকে সুস্থ ও সুদৃঢ় কর, মনটিকে সতেজ কর, সজীব কর আর বুদ্ধিকে প্রদীপ্ততর কর, কর ক্ষুরধার—এই যেন তার নির্দেশ ছিল। অথচ বিচিত্র এই যে, তার চরিত্রের শুভ্রতার কাছে, সাহসের দৃঢ়তার কাছে এবং সঙ্কল্পের স্বচ্ছ ঐকান্তিকতার কাছে নিষ্প্রভ অন্য ছেলেরা স্বতঃই তার নেতৃত্ব মেনে নিত—সর্বক্ষেত্রে ও সর্বসম্মতিক্রমে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যজীবনে মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র ছিল নরেন্দ্রনাথ। অত্যন্ত দুরন্ত বলে, চঞ্চল বলে শিক্ষকগণ বিরক্ত হতেন মধ্যে মধ্যে। তার স্পষ্টবাদিতার জন্য সচকিতও হয়ে উঠতেন মধ্যে মধ্যে।

আবার, নির্ভীক ও সত্যপরায়ণ বলে, প্রাণশক্তিতে ভরপুর বলে, অসাধারণ মেধাবী এবং যথার্থ জিজ্ঞাসু বলে অত্যন্ত ভালও বাসতেন তাকে। তার স্কুল ত্যাগের কয়েক বৎসর পরে যখন তার কনিষ্ঠ

সহোদর মহেন্দ্রনাথ ঐ স্কুলের ছাত্র হয়েছিল তখনও মধ্যে মধ্যে কোন শিক্ষক মহেন্দ্রকে 'নরেন্দ্র' বলে ডাকতেন। ভুল দেখিয়ে দিলে বলতেন অন্য নাম মনে থাকে না। নরেনের নামটাই মনে আছে। এমনি ছিল সে স্নেহসিক্ত ভালবাসা। পড়াশুনা, ওঠা-বসা, চলাফেরা কোনটাই তার আর দশজনের মত ছিল না, সাধারণ ছিল না। সর্বাবস্থায়ই সে অসাধারণ, সকলের মধ্যেই অনন্য।

সারাবৎসর সহস্রবিধ কাজের তার অবধি নেই, অবসর একান্ত দুর্লভ। দেশ-বিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির মধ্যে ডুবে থেকে তার দিন কাটে। সে পাঠ করে, সে মনন করে, ধ্যানে উপলব্ধি করতে সে প্রয়াসী।...

কুস্তি লড়ে শরীর মজবুত করে। তপস্যা করে ভগবানকে জানতে চেষ্টা করে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-চর্চায় বহু সময় অতিবাহিত করে। অতি দুর্লভ মধুকণ্ঠ তার স্বভাবগত, সহজাত সম্পত্তি।

আর সব পাঠ্যপুস্তক?

সে-সব তখন তাকের উপরেই তোলা থাকে। কিন্তু দৃঢ় শরীর ও তীক্ষ্ণ মেধার বলে পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে দু'চারদিনেই সে প্রস্তুত হয়। এক রাত্রেই হয়ত চার-খণ্ড জ্যামিতি আয়ত্ত করে পরীক্ষা দিয়ে আসে। মুখে মুখে সাহিত্য ও ইতিহাসের পাঠ প্রস্তুত করে নেয়।

এমনি অসামান্য এবং অসাধারণ তার সব কিছু।

পাসের পড়া তার কাছে অতি সামান্য, তুচ্ছ জিনিষ। পাঠ্য-পুস্তকের অপরিসর গণ্ডীর মধ্যে তার বুভুক্ষু, জিজ্ঞাসু মনের পিপাসা মেটে না, তৃপ্তি আসে না।

দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে সে তত্ত্ব আহরণ করতে চায়, সত্য জানতে চায়,—অন্তরের তলহীন গভীরতায় প্রবেশ করে উপলব্ধি

করতে চায় মানবের জীবন-জটিলতার তাৎপর্য, মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

কে যেন তাকে বলে,…অকথিত ইঙ্গিতে প্রায়ই বলে—সেই মন্ত্র, যে মন্ত্র পরবর্তীকালে বজ্রনির্ঘোষে নিজ দেশবাসীকে সে শুনিয়েছিল…

চরৈবেতি, চরৈবেতি—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত। ওঠ, জাগ, চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগে থেম না।

কারণ,…নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

তাই ধ্যানে ও বিদ্যাচর্চায় সে মন ও বুদ্ধিকে সমৃদ্ধ করতে চায়। দেহটিকে দৃঢ় করে—কর্মের জন্য ও ভগবান লাভের জন্য প্রস্তুত হতে চায়। নিরলস ও অক্লান্ত তার সাধনা, অদম্য আকাঙ্ক্ষায় সদা উদ্বেলিত তার মনপ্রাণ!

* * * * *

তার উপস্থিতবুদ্ধি ও দুর্দম সাহসের অসংখ্য কাহিনী রয়েছে তার জীবন কথায়। তাদেরই ছোট একটি গল্প এখানে বিবৃত করব, উদাহরণ হিসাবে।

নরেন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসগৃহের অদূরে একটি জিম্‌নাষ্টিকের আখ্‌ড়া ছিল সে-কালে।

সে অখ্‌ড়ায় একটা ট্রাপিজ খাটাবার দরকার হয়েছিল একদিন। নরেন তার দলবল নিয়ে খুব মেতে উঠেছিল ট্রাপিজ খাটাতে। কিন্তু বিরাট ট্রাপিজের গুরুভার-ফ্রেম দাঁড় করান খুব সহজ সাধ্য ছিল না। কাজেই ছেলেদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছিল। চারদিকে ভীড় জমে গেছে।

একজন বলিষ্ঠ ইংরাজ পুরুষ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছেলেদের

কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। নরেন সহসা গিয়ে তাঁকেই অনুরোধ করল সাহায্য করবার জন্য!

সপ্রতিভ ও স্বাস্থ্যবান একটি বালকের নিঃসঙ্কোচ অনুরোধে সাহেবও রাজী হল এবং রাজী হয়ে ট্রাপিজের গোড়াটা পায়ে চেপে ধরে মাটিতে ঢোকাতে শুরু করল, আর তার মাথার দিকে দড়ি বেঁধে ছেলেদের বলল টেনে তুলতে। মহা উৎসাহে প্রাণপণ শক্তিতে টানছে ছেলেরা তাদের সর্বসামর্থ্য নিয়োগ করে।

অনেকটা উঠেও গেছে ট্রাপিজ, আর একটু হলেই সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু এমনি সময়ে অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটে গেল। হঠাৎ মাথায়-বাঁধা টান্-দড়িটা ছিঁড়ে গেল, আর ট্রাপিজের গুরুভার ফ্রেমটাও ভীষণ শব্দে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে, মুহূর্তে গোড়ার দিকটা উপরে ছিটকে উঠল এবং সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়ে দিল···

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সাহেব। রক্তে লাল হয়ে গেল ভূমি। সে এক সঙ্কটময় মুহূর্ত!

ছেলেরা ভাবল সাহেব মরেই গেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভীতত্রস্ত হয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে গেল—শুধু ছেলেরাই নয়, আশে পাশে বয়স্ক যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাও।

কিন্তু স্থির-বুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ আহত ইংরেজটিকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গেল। নিজের বস্ত্র ছিন্ন করে সাহেবের মাথায় পটি বেঁধে দিল, এবং দু'একজন সঙ্গী, যারা তখনও সেখানে ছিল তাদের সাহায্যে অশেষ যত্নে তার জ্ঞান ফেরাল—মাথায় জল দিয়ে, বাতাস দিয়ে।

তারপর তাকে পার্শ্ববর্তী এক গৃহে স্থানান্তরিত করে, ডাক্তার দেখিয়ে, সাত-আটদিন ধরে চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় সুস্থ করে বিদায় দিল। আবার, বিদায় দেবার প্রাক্কালে পাড়ায় চাঁদা সংগ্রহ করে হাত খরচের জন্য কিছু অর্থও দিয়ে দিল সাহেবকে।

এই বাল্যকালেরই তারও একটি কাহিনী এখানে বিবৃত করছি। সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির নিদর্শন হিসাবে তার বিস্তৃত জীবনাখ্যায়িকার অনেকগুলিতেই এটির উল্লেখ রয়েছে।...

সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে একবার মেটিয়াবুরুজের একটি পশুশালা দেখবার উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে গমন করেছিল নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রত্যাবর্তন কালে নৌকামধ্যেই দলের একটি বালক অত্যন্ত অসুস্থ হয় এবং নৌকার ভিতর বমন করে ফেলে।

ফলে, নৌকার মাঝিরা বিষম ক্রুদ্ধ হয় এবং বালকদের সঙ্গে প্রচণ্ড কলহে প্রবৃত্ত হয়। 'আগে নৌকা পরিষ্কার করে দাও, তারপর পাড়ে নাবতে পারবে'—এই তখন তারা দাবী করতে থাকে। বালকরা অনেক অনুনয় করল, দ্বিগুণ পয়সা দিতে চাইল কিন্তু মাঝিরা কোন কথা শুনতে রাজী নয়, দ্বিগুণ পয়সা দিলেও নয়।

ইতিমধ্যে নৌকাটি স্রোতের টানে তীরের অনেকটা কাছে এসে পৌঁছেছে। অদূরে দেখা যাচ্ছে, পল্টনের দু'জন গোরা সৈনিক নদী তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুহূর্ত মধ্যে নরেন্দ্রনাথ নিজ কর্তব্য স্থির করে ফেলল। মাঝিদের অলক্ষিতে নৌকা থেকে সে তীরে লাফিয়ে পড়ল এবং দ্রুতপদে গোরা সৈনিকদের কাছে গিয়ে তাদের একজনের হাত ধরে আবেদন জানাল ইংরাজী বাংলা মিশিয়ে, আর আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল নিজেদের বিপদের ব্যাপারটি। সে আবেদনের ফলও হল অপ্রত্যাশিত।

সুদর্শন বালকের সে নির্ভিক. নিঃসঙ্কোচ আবেদনে সৈনিকদ্বয়

মুহূর্তে উৎসুক হয়ে উঠল এবং মাঝিদের প্রতি কঠিন নির্দেশ দিয়ে নরেন্দ্রনাথের সহযাত্রীদের উদ্ধার করে দিল। হৃষ্টচিত্তে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীদের নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

* * * *

এমনি করেই বিপদের সামনে স্থির হয়ে, ভয়শূন্য হয়ে সে দাঁড়াত শিশু বয়সেই। একবার দুবার নয়—বহুবার, এ-জাতীয় পরীক্ষা তার সম্মুখে এসেছিল শৈশবকালে—কিন্তু পরীক্ষা যত কঠিনই হোক, ভয়ে পেছিয়ে যাবে অমন দুর্বল সংস্কার বা ক্ষীণ মানসিক শক্তি নরেন্দ্রনাথের ছিলনা। 'অভীঃ' মন্ত্রের উদ্গাতা—জীবনের উদয়-লগ্ন থেকেই নির্ভীকতার এক জীবন্ত, প্রত্যক্ষ উদাহরণস্বরূপ জগতের সম্মুখে প্রতিভাত হত। উত্তরজীবনে, নিজ বাল্যকালের প্রসঙ্গে তাই তাঁর স্বকীয় উক্তি এইরূপ ছিল—'ছোট বেলা থেকেই একটা একগুঁয়ে দানা ছিলুম আর কি! নৈলে কি আর কপর্দকহীন অবস্থায় সমস্ত দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম?'…

গভীর ধ্যান-তন্ময়তা নরেন্দ্রনাথের জন্মগত আর একটি শুভ সংস্কার ছিল। এরও একটু উল্লেখ পূর্বে করেছি।

ধ্যান করতে বসে অতি অল্প বয়সেই যে সে তন্ময় হয়ে যেত, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলত—সে কথাও বলেছি। কিন্তু কতটা তন্ময় হত—তারই একটি অনবদ্য কাহিনী এখানে বলব।

ধ্যান করতে বসে নিজ মনকে সম্বোধন করে সে বলত,—মন, তুমি একেবারে চিন্তাশূন্য হয়ে, নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির ঊর্দ্ধমুখী হয়ে থাক। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না, যোগভ্রষ্ট হয়ো না। তা হলে প্রার্থিত বস্তু লাভ করতে পারবে না।…

সংযত, ধ্যানসিদ্ধ তার মন তাই থাকত।

গৃহে দ্বার রুদ্ধ করে এমনিভাবে ধ্যান করতে করতে একদিন তার এক বিচিত্র দর্শন উপস্থিত হয়েছিল। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ সে দেখেছিল এক গৌরকান্তি দীর্ঘ সন্ন্যাসী-মূর্তি তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরিধানে তাঁর গৈরিক, হস্তে কমণ্ডলু।

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে অনুপম করুণা, মুখে প্রশান্ত আনন্দেব দিব্য অভিব্যক্তি।

কিশোর নরেন্দ্রনাথ দেবদর্শন লাভ করেছিল সেদিন—সেই বয়সেই।

কিন্তু কে সে দেবতা? কার দর্শন লাভে ধন্য হয়েছিল সে?

আমবা জানি না, নবেন্দ্রও ঠিক জানে না।—

তবে সে বলত, জীবনের প্রান্তে গিয়ে—যখন ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ বলে, অবতারকল্প ঋষি বলে নিজে সে জগৎপূজ্য হয়েছিল তখনও বলত:

হতে পারে ভ্রম, কিন্তু তবু মনে হয় ভগবান বুদ্ধদেবের পুণ্য দর্শনলাভে আমি সেদিন ধন্য হয়েছিলাম। প্রেম ও মৈত্রীর মূর্ত বিগ্রহ দেব তথাগত অযাচিত করুণায় আমার ধ্যানমানসে আবির্ভূত হয়ে-আমায় ধন্য করেছিলেন সেদিন।...

আরও একটা খেয়াল ছিল নরেন্দ্রের শৈশব জীবনে।

যখনই কোন মহাপুরুষের কথা সে শুনত, বিশেষ করে ধর্মজগতের, তখনই তাঁকে দর্শন করবার জন্য, প্রণাম করবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যেত। একান্ত আপন-জন বোধে তার চিত্ত কি সেই সব ক্ষণে উন্মুখ হয়ে উঠত? কে জানে, কে বলবে?

কিন্তু ফাঁকা কথা বা বৃহৎ মুখস্থ বুলি সে বেশীক্ষণ সইতে পারত না। সোজাসুজি সামনে গিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করে বসত...

আপনি যা উপদেশ দিচ্ছেন তা নিজে কি উপলব্ধি করেছেন? ভগবানকে কি, স্বয়ং দর্শন করেছেন? যদি করে থাকেন তবে সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা বলুন। আমি সেই বার্তাটি শুনতে চাই।

প্রাচীন যুগের সেই শাশ্বত উক্তিরই অনুরূপ যেন কথা—যদ্ যদ্ পশ্যসি তদ্বদ।···

আর উত্তর শুনে সব জায়গা থেকেই সে নিরাশ হয়ে ফিরে আসত। ভগবান দর্শন করেছেন,—ভগবৎতত্ত্ব উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছেন, এমন কথা কেউ বলতে পারত না।

এমনিভাবে একবার অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গ্রীনবোটের ভিতর সে প্রবেশ করেছিল। তিনি তখন কলিকাতার উপকণ্ঠে, গঙ্গার বুকে এক গ্রীনবোটের মধ্যে আপনভাবে ধ্যান-উপাসনায় জীবন যাপন করছেন। অপরিচিত যুবক, অনেকটা যেন হতাশ এবং অনন্যোপায় হয়েই সে জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে দিন। সর্ব অবয়বে তার কী তীব্র ও উৎকণ্ঠ ব্যাকুলতা! কী তীক্ষ্ণ ও উৎসুক জিজ্ঞাসা!

তারপর, সে ঋষি-প্রতিম দীর্ঘাঙ্গ পুরুষকেও সেই একই প্রশ্ন সে জিজ্ঞাসা করছিল,···ভগবানকে কি আপনি স্বয়ং দর্শন করেছেন?

সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অপরিচিত-প্রায় এক কিশোরের আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হয়েছিলেন, বোধ করি খানিকটা বিমূঢ়ও হয়েছিলেন। অকপটে বলেছিলেন—না বৎস, আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু তোমার চক্ষু, যোগীর চক্ষুরূপে প্রত্যক্ষ করছি। তুমি ধ্যান অভ্যাস কর, হয়ত তুমিই সাক্ষাৎ পাবে ভগবানের।

এইরূপে শত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শৈশব ও বাল্যজীবন পেরিয়ে কৈশোরের উপান্তে উপনীত হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ।

এর মধ্যে এন্ট্রান্স পরীক্ষাও পাস করেছে সে এবং তখনকার জেনারেল এসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউসনের ছাত্র হিসাবে এফ এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক হেষ্টি সাহেব তখন ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। ধর্মপ্রাণ ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন হেষ্টি সাহেব। নরেন্দ্রনাথের শ্রেণীতে একদিন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়াতে এসে প্রসঙ্গতঃ তিনি উল্লেখ করেছিলেন ভাব-সমাধির কথা, নির্বিকল্প সমাধির কথা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অলৌকিক দর্শনাদির কথা, তাঁর ভগবানের নামে মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধির কথা। তাঁর নাম তখন কলিকাতায় বহুজনের মুখে প্রচারিত। তাঁর পুণ্যজীবন ও চরিতকথা তখন শিক্ষিত সমাজের অনেকের বিশেষ আলোচনা ও ধ্যানের বস্তু।

নরেন্দ্রনাথ সচকিত হয়ে শুনল। ভাবতে লাগল মনে মনে—কে এই রামকৃষ্ণ? কতদূরে দক্ষিণেশ্বর? তিনি কি তবে দর্শন করেছেন ভগবান? উপলব্ধি করেছেন ধর্মতত্ত্ব?···

ভাবতে থাকে। ব্যাকুল হয়ে, উন্মনা হয়ে দিনের পর দিন ভাবতে থাকে নরেন্দ্রনাথ। ক্রমে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তার অন্তরে সেই পাগল পূজারীকে দেখবার জন্য, তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য।

দিন যায়, মাস যায়। ব্যাকুলতা বাড়তেই থাকে, অতৃপ্ত ঐকান্তিক পিপাসা অবশেষে শুভ মুহূর্তটিকে, পরম লগ্নটিকে এগিয়ে নিয়ে আসে।

তারপর একদিন সত্যি দেখা হয়।

নিজের বাহ্যিক কোন প্রচেষ্টায় নয়,—পরন্তু ঘটনার অনিবার্য যোগাযোগে, আর দৈব-নির্দেশে সে ঐতিহাসিক যোগাযোগ সংঘটিত হয়। প্রথমে, পাড়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে এক প্রতিবেশী ভক্ত-বাটীতে সংগীত পরিবেশন ব্যপদেশে। তারপর, গঙ্গার তীরে সেই প্রখ্যাতনামা দেব-দেউলে, কূর্ম-পৃষ্ঠ মহাতীর্থে, দক্ষিণেশ্বরে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, মধুর হেমন্ত ঋতুর বিদায় মুখে।

ভাব-পাগল, দিব্যোন্মাদ রামকৃষ্ণ দেখেন নরেন্দ্রকে—বিশেষ করে দেখেন তার চোখ, মুখ, অঙ্গলক্ষণ।

ভাবেন মনে মনে, বিষয়ী লোকের আবাস জনাকীর্ণ, ভোগ-লোলুপ কলিকাতায় এ অগ্নিময় কিশোর কোথা থেকে এল, এতবড় সত্ত্বগুণী আধারের জন্ম কেমন করে সম্ভব হল! চারদিকের ভোগপঙ্কিলতার আবর্তের মধ্যে এমন শুদ্ধ, ত্যাগদীপ্ত জীবনের অভ্যুদয় সংঘটিত হল কোন দৈবনির্দেশে? কী এর প্রসুপ্ত সংস্কার? কোন্ মহাব্রত উদ্‌যাপনে এই মাটির পৃথিবীতে এর আগমন হয়েছে?

আবার নরেন্দ্রনাথও দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। গভীর বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসায় মিশ্রিত সে দৃষ্টি। কে এই মহাজন? ভাব-বিহ্বল, ও সারল্য-বিগ্রহ পুরুষ, কে ইনি? দুই বহ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষ যেন পরস্পরের সান্নিধ্যে তীব্র ঔৎসুক্যে সচকিত হয়ে উঠেছিল সেদিন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কি মনে করে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গান গাইতে অনুরোধ করেন নরেন্দ্রনাথকে।

বাংলা গান তখনও নরেন্দ্রনাথ বেশী শেখেনি, দু'চারটি মাত্র শিখেছে। তবু অনুরোধ এড়াতে না পেরে স্বভাবসিদ্ধ তন্ময়তায় গান গায় নরেন্দ্রনাথ ঃ

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে—
ভ্রম কেন অকারণে ?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেহ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলেছ আপন জনে ?
সত্য পথে মন, কর আরোহণ—
জ্ঞানের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিধন
গোপনে অতি যতনে।...

গান শুনতে শুনতেই সমাধিস্থ হন শ্রীরামকৃষ্ণ।...বিস্মিত হয়ে, স্তম্ভিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ দেখেন রামকৃষ্ণকে. দেখেন তাঁর সেই অদ্ভুত অলৌকিক অবস্থা! এমন বিচিত্র দর্শন ইতিপূর্বে তাঁর অদৃষ্টে আর কখনো ঘটেনি।...

তাঁর ভাব-সমাধির কথা. ভগবানের জন্য সর্বত্যাগের কাহিনী ইতিপূর্বে তিনি শুনেছেন মাত্র, আজ চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনে কণ্টকিত হয় তাঁর দেহ-মন, অভিভূত হয় সমগ্র চেতনা!

কিন্তু কি বিশেষ চিন্তা-প্রবাহে, কী গভীর ভাবাবেগে তাঁর অন্তর-

প্রদেশ যে আলোড়িত হয়েছিল সেদিন, তা সঠিক নির্ণয় করে আমরা বলতে পারিনা, তিনি নিজেও কখনো বিশদ করে সে কথা কাউকে বলেন নি।

শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-লেখার অক্ষয় লিপিতে চিহ্নিত হয়ে যায় সেই প্রথম মিলনেব পুণ্য-লগ্নটি।

একদিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনাদর্শের মূর্ত-বিগ্রহ, বিশ্বাস, ভক্তি ও নির্ভরতার ঘনীভূত প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ,—গুরুবাক্যে আস্থাবান, শাস্ত্রবাক্যে আস্থাবান, জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সহজ ও স্থিতপ্রজ্ঞ, সে এক অদ্ভুত দিব্যপুরুষ,—আর অপরদিকে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নূতন যুগের ও আধুনিক ভারতের তরুণ প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-প্রণালীতে বিশ্বাসী, যুক্তি-বিচার ও প্রত্যক্ষ মাত্রে আস্থাবান—সংশয়-জর্জর উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রতিভূ নবেন্দ্রনাথ। নিঃশেষ আত্ম-নিবেদন আর কঠিন আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক সন্নিকটতা।

সে এক বিচিত্র পবম মুহূর্ত,—শুধু ঐ যুগ্মজীবনের পক্ষেই নয়, পরন্তু সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষে, মানব সভ্যতার ভাবীকালের পথ-নির্দেশের পক্ষে।

এখানেও কিন্তু সেই একই প্রশ্ন নির্গত হল নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে—ভগবানকে কি প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন রামকৃষ্ণ? ধর্মতত্ত্ব কি উপলব্ধি করেছেন জীবনে?…

হাঁ, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবানকে; স্পর্শ করেছেন সেই পরম পুরুষকে।…

বেদাহমেতং পুরুষম্ মহান্তম্...

সত্য, শান্তি, দয়ারূপে
ভূতে ভূতে তিনি অধিষ্ঠান।
তিনি নিত্য, তিনি স্থির,
তিনি ভূমা, তিনিই মহান।
তমসার পারে, তিনি জ্যোতির্ময়—
তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি,—

তিনি অমৃতের সন্ধান লাভ করেছেন,—তিনি নিঃসংশয়। নরেন্দ্রনাথকেও দেখাতে পারেন, স্পর্শ করাতে পারেন—যদি সে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে, তাঁর নির্দেশে পথপরিক্রমায় সম্মত হয়।

একি স্পষ্ট, নির্ভীক উক্তি!

জীবনে এমন কথা কখনো শোনেননি নরেন্দ্রনাথ। জীবনে এমন ব্যক্তির দর্শনলাভও তাঁর ভাগ্যে ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। মুহূর্তে এক মহাবিপ্লব ঘটে গেল তাঁর অন্তর-জীবনে। অদ্ভুৎ অবর্ণনীয় অনুভূতি, অনাস্বাদিতপূর্ব এক অবাচ্য উন্মাদনা গ্রাস করল যেন তাঁকে।...

আবার পরক্ষণেই নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সে কী আকুল আবেদন, কী অপ্রত্যাশিত স্তুতি-প্রকাশ! সেও এক মহাবিস্ময়।...

'এতদিন পরে কি আস্‌তে হয়? তোমার জন্য কেমন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে রয়েছি আমি...সে কথা কি একটিবার ভাবতে নেই? কথা কইতে না পেরে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আছে। আমার দিন কাটেনা, সময় কাটেনা।' ইত্যাদি...

আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-মিশ্রিত সে কী বিচিত্র বন্দনা!... 'জানি

আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী-নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছ।'…

এমনি আরও কত কথা, বিগলিত স্নেহধারার কত অনবদ্য প্রকাশ। চক্ষে স্বর্গীয় প্রেমাশ্রুর অশ্রান্ত প্রবাহ,…সব বুঝতে পারলেন না, ধরতে পারলেন না নরেন্দ্রনাথ।…

কিন্তু স্তম্ভিত হলেন, বিস্মিত হলেন। সেই স্বর্গীয় নিষ্কলুষ সরলতা, নিঃসংশয় ভগবদ্বিশ্বাস মুগ্ধ করল তাঁর মনপ্রাণ, দীপ্ততেজে উদ্ভাসিত সেই জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল—এক দিব্য আকর্ষণের সৃষ্টি করল অন্তরে। সে আকর্ষণের কি পরিমাপ হয়? সে কি অতিক্রম করা সম্ভব?

গভীর চিন্তা ও অবর্ণনীয় একটি মনোভাব নিয়ে গৃহে ফিরেছিলেন সে দিন নরেন্দ্রনাথ।

সন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকের এ-কথা। বিগত যুগের প্রায় শেষ পর্যায়ের এ-কাহিনী।

তারপরের যে ইতিহাস তার গতি অতি দ্রুত-ধাবমান। নরেন্দ্রনাথের মানসক্ষেত্রে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও অতি গভীর এবং দূর-প্রসারী। পূর্বেই বলেছি মুহূর্তে যেন একটি বিপ্লব, একটি কালান্তর ঘটে গিয়েছিল নরেন্দ্রনাথের জীবনে। সে দেব-মানবের প্রতি একটি অনিবার্য আকর্ষণ, একটি অবর্ণনীয় শ্রদ্ধা ও কৌতূহল-মিশ্রিত মনোভাব অতি শীঘ্র তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে—দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, আরও কতবার কে জানে?

এমনি করে দিনে দিনে চলল যাতায়াত। গাঢ় থেকে গাঢ়তর হল সম্পর্ক এবং একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় বৎসর কাল মধ্যে সেই দুই যুগ-মানবের সম্বন্ধসূত্রে ক্রমশঃ যে-কাহিনী বিরচিত হল—দান ও গ্রহণের মাধুর্যে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব-সমূহের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মহিমায়

সে অক্ষয় হয়ে রইল ভারতবর্ষের—তথা, বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের নবতম অধ্যায়টিতে।

প্রতিভাবান ও সুদক্ষ স্থপতি কঠিন অথচ দুর্লভ উপাদানে গঠিত প্রস্তরখণ্ড হাতে পেয়ে যেমন মুহূর্তে উৎসুক হয়ে ওঠে এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সুনিপুণ পরিচালনায় দিনে দিনে, তিলে তিলে তারই মধ্য থেকে নিজ মনোগত অবয়বটিকে রূপায়িত করে মৌলিক সৃজনেব গভীর আনন্দে পরিতৃপ্ত হয়,—নরেন্দ্রনাথের অনন্য জীবনটিকে হাতে পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি মহৎ সৃষ্টির সম্ভাবনায় তৎপর হযে উঠেছিলেন, উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। উপাদান চিনতে তাঁর ভুল হয়নি, বিলম্ব ঘটেনি।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ? তার দিক থেকে অবশ্য প্রতিঘাত ছিল, প্রস্তরখণ্ডের উপাদান-কাঠিন্যেরই মত। সে কাঠিন্য যেমন অস্ত্রাঘাতকে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতিহত করতে চায়—আবার তারই ফলে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর দ্যুতি লাভ করে সাধারণ থেকে অসাধারণ মসৃণতায় বিচিত্র হয়ে ওঠে—নরেন্দ্রনাথের অনন্য জীবনটিও ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনে ও পরিণতিতে মহিমান্বিত হয়েছিল, সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

সহস্রদল একটি রক্তকমল যেন বিরাট ব্যক্তিত্বের অনিবার্য, অলঙ্ঘ্য প্রভাবে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে ও সুষমায় দিনে দিনে বিকশিত হতে শুরু করেছিল।

দেখতে দেখতে বানের মুখে ফেনার মত, ঝড়ের মুখে খড়ের কুটাব মত চকিতে ফেসে গেল সংসার, সমাজ ও পরিবার। দূরে কোন্ দিগন্ত পথে নিঃশেষে অবলুপ্ত হল জাগতিক প্রতিষ্ঠার বহু-বিস্তৃত কামনা, নামযশ ও প্রতিপত্তির দুর্দম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কেমন করে

সেটি সংঘটিত হল—বহুর মধ্যে, তারই একটি অনবদ্য কাহিনী এখানে বিবৃত করছি।

পিতা বিশ্বনাথ তখন সদ্য লোকান্তরিত হয়েছেন। ফলে, বিধবা জননী আর অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাইবোনদের নিয়ে একটি বিপুল সাংসারিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন উপার্জনহীন নরেন্দ্রনাথ।

রৌদ্রস্নাত, প্রাচুর্যের স্বচ্ছল সংসারে অকস্মাৎ অর্থকষ্টের নিদারুণ অন্ধকার নেমে এসে তাঁকে যেন উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে।...

বাস্তবজগতের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটছে অর্থোপার্জ্জনের নিষ্ফল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। এবং তার স্বার্থপূর্ণ, নীচ, নগ্নরূপ নরেন্দ্রনাথের আজন্মবর্ধিত সকল স্বপ্ন ও কল্পনার ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করেছে। চারদিকে কেবলি ব্যর্থতা আর অন্ধকার, কেবলি সংশয় আর হতাশা।

নিরুপায় নরেন্দ্রনাথ একদিন শেষে রামকৃষ্ণকে গিয়ে ধরে বসেন তাঁর সেই দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেবার জন্য।

বলেন,—'আপনার মা'কে বলে আমার মা ও ভাইদের অন্নকষ্ট দূর করে দিন। ওদের কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারি না।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে সম্মত হন না, হতে পারেন না। বলেন,—'ওরে ও-কথা যে আমার মুখ দিয়ে বের হয় না, কখনো হয়নি।...তুই মাকে মানিস না, তাই তোর এত কষ্ট। তুই নিজে গিয়ে মা'র কাছে বল, প্রার্থনা কর, সব কষ্টের অবসান হবে তোর'...

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে নরেন্দ্রনাথ তখন নিরাকারবাদী। দেব-বিগ্রহে আস্থাহীন, মূর্তিপূজায় অবিশ্বাসী।...

'সে আমি পারব না।'...প্রতিবাদ করে নরেন্দ্রনাথ। বলে,...

'আমি মাকে জানি না, মানি না। আমার কথা তিনি শুনবেন কেন? আমার জন্য আপনাকেই বলতে হবে।'…

ভালবাসার এমনি আবদার এড়াতে না পেরে শেষে বাধ্য হয়েই যেন বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ…'আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার। আমি বলছি আজ তুই নিজে গিয়ে মা'র কাছে যা চাইবি, তাই পাবি।…মা আমার ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন—তিনি ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন? যা তুই নিজে গিয়ে নিজের প্রার্থনা জানিয়ে আয়। মা অবশ্য তোর প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।'

অবশেষে তাই স্থির হয়। সন্ধ্যারতির পর কালীমন্দিরে মা'র কাছে নিজমুখে প্রার্থনা নিবেদন করতে রওনা হন নরেন্দ্রনাথ—নিঃসঙ্গ, একাকী।…

* * * *

স্বভাবতঃ নিস্তব্ধ কালীমন্দির সেদিন একেবারে জনহীন। স্তিমিত দীপশিখায় রহস্যময় ও অর্ধালোকিত সে প্রশস্ত দেবদেউল। বরাভয়করা মহামায়া প্রত্যক্ষ সেথায় বিরাজমানা।…

উদ্বেলিত অন্তরে নরেন্দ্রনাথ তাকিয়ে দেখেন সে দেবী-প্রতিমার অপার্থিব বিগ্রহ। প্রতিমা নয়, প্রস্তর নয়, জীবন্ত, জাগ্রত, প্রত্যক্ষ দেবতা।…

মুহূর্তে তিনি আত্মহারা হয়ে যান, এককালে বিহ্বল হয়ে পড়েন। নিশীথিনীর নিভৃত নিরালায় মহাকালের বুকে নৃত্যপরা, হাস্যময়ী সে মহাকালীর সঙ্গে সত্য সত্যই এমনি করে নরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুকী, অপার্থিব করুণায়।

কী সে অবাচ্য অনুভূতি! কী সে অকল্পিত, অক্ষয় মুহূর্ত!

উচ্ছ্বসিত ভাবরাশী সমগ্র সত্ত্বাকে ছাপিয়ে, ভাসিয়ে যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছে, উত্তাল হয়ে উঠেছে। তাকে থামান যায় না, রোধ করা যায় না। একান্ত ভাবাবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ নিজেকে নিঃশেষে মায়ের পায়ে নিবেদন করে দেন। ভূলুণ্ঠিত হয়ে বলেন…'মা জ্ঞান দাও, বিবেক-বৈরাগ্য দাও, তোমার অবাধ দর্শনের অধিকারী করে দাও! …ইহজীবনে আর আমার কিছু কামনা নেই, কোন প্রার্থনা নেই।'

আর মা!…মা তাঁর চিহ্নিত-সেবকের সে অকপট প্রার্থনা সর্বাংশে পূর্ণ করে দেন অতি অল্পকাল মধ্যে। তখন—

কেবল একটি মাত্র কামনা, একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা সকল কামনাকে আবৃত করে উদগ্র হয়, প্রচণ্ড হয় তাঁর জীবনে। সমাধি-সুখ লাভ করব, শত বিচিত্ররূপে তাঁকে দর্শন করব, প্রত্যক্ষ করব। আর তারই ফলে শুরু হয় তপস্যা, কঠিন ও নিরলস তপস্যা।…

পদ্মের কুঁড়ি যেমন নিশার অন্ধকারের অনিশ্চয়তার মধ্যে একান্ত নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে শতযোজন দূরের সূর্যের দিকে মুখটি তুলে অপেক্ষা করে থাকে—আলোর প্রত্যাশায়, উত্তাপের প্রত্যাশায়,—নরেন্দ্রনাথের হৃদয়-পদ্মটিও তেমনি এইকালে সমগ্র চেতনা নিয়ে ঊর্দ্ধমুখিন্ তপস্যায় নিরত হয়েছিল।

হিরন্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখটি আবৃত রয়েছে। সে আবরণ অপসারিত করতে হবে।

অতএব তাঁর অবিশ্রাম প্রার্থনাই ছিল একালে—

হে পূষন, হে সূর্য, আচ্ছাদন উন্মোচিত কর, আবরণ অপসারিত কর—'তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মার্থ দৃষ্টয়ে।'

…আমি সত্যকে জানব, ধর্মকে উপলব্ধি করব।

ধীরে ধীরে সে অকপট ও তীব্র প্রার্থনার ফলও ফলতে সুরু করেছিল। দর্শনের পর দর্শন, গভীর থেকে গভীরতর সমাধিসুখ আস্বাদন করতে করতে সহসা একদিন নির্বিকল্প সমাধির নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দধারায় সে অবগাহন করেছিল, নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেও অল্পকালের জন্য।

সমাধির দিব্য-আনন্দ, যাকে শাস্ত্রে পরম ও চরমানন্দ বলে উল্লেখ করেছে—তাতে নিমগ্ন থাকবার কামনাও তাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়েছিল…রামকৃষ্ণেরই নির্দেশে, রামকৃষ্ণেরই করুণাঘন জীবনাদর্শের অভিনব প্রেরণায়।…

ত্রিসংসারে যাদের কেউ নেই…সর্বহারা নিঃস্ব যারা,…যুগ যুগ ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কেবল ধনীর ধন জুগিয়েছে, বিলাস জুগিয়েছে, নিজেরা অনাহারে থেকেও বিত্তশালীদের অন্ন জুগিয়েছে …তাদের চোখের জল মোছাবার জন্য, ব্যথা দূর করবার জন্য,…

বহু-যোজন-প্রসারিত-শাখা, বিশালাকৃতি সহস্রায়ু বনস্পতির পত্র-ছায়াতলে তাপিতজন যেমন আশ্রয় পায় রৌদ্রতপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্নে, তেমনি করে দাবদগ্ধ সংসারে শান্তির সিগ্ধছায়া বহুধা বিস্তৃত করবার জন্য…

আর,…সুপ্তিমগ্ন, দাসত্বলাঞ্ছিত ভারতবর্ষকে কল্যাণকর্মে জাগরিত করবার জন্য…সমাধির পরমানন্দকেও তুচ্ছবোধে দূরে সরিয়ে রাখতে উদ্দীপ্ত করলেন, উদ্বুদ্ধ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে।

বললেন, 'নিজের মুক্তিকামনা, সেও ত কামনা, সেও ত স্বার্থ-পরতা। নিজের জন্য সমাধিসুখলাভ সেও ত বহুলাংশে ব্যক্তিগত কথা…

বিপুল বিশ্বে নিরবধি-কালপ্রবাহের সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায়?…কাজেই, ও সব নয়, তুই হবি বিরাট বট-বৃক্ষের মত,- শতসহস্র যোজন বিস্তৃত হবে তোর শাখা-প্রশাখা!

সংসারে দুঃখপীড়িত দুর্বল যারা, ব্যথিত আর্ত যারা,—তারা এসে তোর জীবন-মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় পাবে, শান্তি পাবে, আর আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার শক্তি লাভ করবে। সর্বতোভাবে পরার্থে উৎসর্গীকৃত হবে তোর জীবন। তোর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সংস্পর্শে এসে সংশয়-পীড়িত নর-নারী সাহস সঞ্চয় করবে, দুর্বল জন বললাভ করবে।

এইভাবে, মহামায়ার মহতী ইচ্ছার বেদীমূলে—'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়' নরেন্দ্রকে উৎসর্গ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

পুরাতনের দুর্লভ উপকরণে জগতে নূতন জ্যোতির্ময় পুরুষের আবির্ভাব হল, যেমনটি পূর্বে কোন দেশে, কোন যুগে সম্ভব হয়নি। নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হলেন মানব-কল্যাণব্রত বিবেকানন্দে।

পরমার্থের জন্য ইহলৌকিক ভোগ-বাসনা ত্যাগ, অরূপের সাধনায় রূপের ঐকান্তিক বিসর্জন, এই প্রাচীনা পৃথিবী একাধিকবার, একাধিকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছে। কুলরক্ষার জন্য একজনকে ত্যাগ করবে, দেশরক্ষার জন্য গ্রাম এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করবে।

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

এ তো ভারতবর্ষের চিরন্তন কথা। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু তপস্যার প্রভাবে এবং সর্বত্যাগের দীপ্তিতে পরমার্থ যখন হাতের মুঠায় এল, 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হল—তখন গুরুর

আদেশে সে পরমপ্রাপ্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে লোক-কল্যাণের মহাব্রতে আত্মনিয়োগের দুর্লভ দৃশ্য সেই প্রথম এই মাটির পৃথিবীতে দর্শন করে মানব-সমাজ ধন্য হল, কৃতার্থ হল। জয়ধ্বনি নিনাদিত হল অলক্ষ্য আকাশে :

'নরলোকে বাজে জয় শঙ্খ,
সুরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক।
এল মহাজীবনের লগ্ন।'

কিন্তু একদিন অথবা দু'দিনে কি সে ব্যাপক ও মহাব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছিল? সিংহবীর্য নরেন্দ্রনাথ কি অতি সহজেই আত্মনিবেদন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে?

না, তা করেননি।

সন ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত দীর্ঘ পাঁচবৎসর কালের বিচিত্র ইতিহাসের অন্তরালে সে আত্মনিবেদনের অনবদ্য কাহিনী লুক্কায়িত আছে।

* * * *

ঠাকুর বলতেন, 'সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে সাধুকে বিশ্বাস করবি!'

বলতেন—'একটা মাটির হাঁড়ি কিনতে গেলে লোকে তিনবার বাজিয়ে দেখে—আর যাকে ইহ-পরকালের জন্য জীবনের পথপ্রদর্শক বলে, গুরু বলে গ্রহণ করবে, তাকে সে দেখে নেবে না? অবশ্য নেবে, নিতে হয়।'

সুতরাং নরেন্দ্রনাথ, যতই তাঁর অনুভূতি-সমূহকে, অতীন্দ্রিয় দর্শনগুলিকে যাচাই করে, পরীক্ষা করে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, যতই তাঁর অপ্রাকৃত দিব্য-জীবনটিকে সর্বভাবে বুঝে নিতে প্রয়াসী

হয়েছেন—ঠাকুর ততই তাঁর মধ্যে বিপুল ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেয়ে, তাঁর ঐকান্তিক সত্যানুরাগের পরিচয় পেয়ে প্রীতি লাভ করেছেন, উৎফুল্ল হয়েছেন এবং নরেন্দ্রনাথের সকল পরীক্ষায় সহজানন্দে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের মত তাঁকে প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অবশ্য সে সহজানন্দ সর্বদাই যে অব্যাহত থাকত তা নয়। মধ্যে মধ্যেই তার পলিমৃত্তিকার স্তরে স্তরে নিবিড় বেদনাশ্রু সঞ্জাত হত এবং কখনো কখনো তার প্রকাশও দেখা যেত গভীর ক্ষোভের মধ্যদিয়ে। বিশেষ রহস্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ সে সব কাহিনী।…

ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পরিচয়ের প্রথম পর্যায়ে ঠাকুরের অপ্রাকৃত দর্শনাদি নরেন্দ্রনাথ কোন মতেই সত্য বলে গ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁর তীক্ষ্ণ, জিজ্ঞাসু মন তাদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায়ই নিরাশ হত, অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে উঠত। এর উপর আর এক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল—ঠাকুরের অদ্ভুৎ, অহেতুক ভালবাসা! বস্তুত, যে ব্যক্তি পরমার্থ সম্পদে সর্বথা সম্পদশালী সে-ব্যক্তি 'নরেন' 'নরেন'—বলে এত ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেন, উঠবে কেন ?

অবিশ্বাস এবং চ্যালেঞ্জের সে সব সমস্যাপীড়িত দিনগুলিতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক একদা যেন একটি বিপর্যয়ের আকারে দেখা দিয়েছিল। সেদিন নরেন্দ্রের দীর্ঘ অদর্শনে একান্ত ব্যাকুল হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রবেশ করেছিলেন, সম্পূর্ণ অনিমন্ত্রিত অবস্থায়। তখন সন্ধ্যাকাল। ব্রাহ্মভক্তগণ উপাসনায় নিরত আছেন। ঠাকুর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেই সহসা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন, আর তাঁকে দেখবার জন্য সহসা সকলের মধ্যে এক ব্যগ্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হল। মন্দিরের কর্তৃপক্ষও সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের

সব বাতি নিবিয়ে দিল। ফলে, এক বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হল মন্দিরের মধ্যে, আর নরেন্দ্রনাথ অতিকষ্টে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে কোন প্রকারে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু, ঠাকুরের প্রতি একান্ত ঔদাসীন্য ও অনাদর নরেন্দ্রনাথের মনে সেদিন যে বেদনার সৃষ্টি করেছিল তারই বশে অতি তীব্র ভাষায় ঠাকুরকে তিনি ভৎ´সনা করেছিলেন। বলেছিলেন, পুরাণে কথিত আছে রাজা ভরত হরিণ ভাবতে ভাবতে মৃতুর পর হরিণ জন্ম পেয়েছিল। এ যদি সত্য হয়, তবে আপনারও আমার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

বালক-স্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ নবেন্দ্রনাথের সে প্রবল আক্রমণে সেদিন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অন্তরে দুঃখ বোধ কবে-ছিলেন প্রচুর। এমন কি মহামায়ার স্বকীয় আশ্বাসেও সে দুঃখ যেন সর্বাংশে নিরসিত হয় নি। এক বিচিত্র আখ্যায়িকাব মধ্য দিয়ে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন সে কথা। বলেছিলেন,— 'ছ্যা্খ, তুই আসল জহুরী। খাঁটি জহরৎ তুই চিনতে পারবি বলেই আমার বিশ্বাস ছিল। আর সেই তুই কিনা মনে করলি আমার দর্শন সব মাথার ভুল। আমি বেহেড্। এ দুঃখ আমি কাকে জানাই বল!...

একটা গল্প শোন্। এক জহুরী একবার একটি খণ্ড হীরক কুড়িয়ে পেয়েছিল। মনে সন্দেহ হলেও সহসা সেটিকে সে চিনতে পারে নি। তাই প্রথমে এক বেগুন-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সে ঐ প্রস্তরখণ্ডটি কিনবে কিনা। আর কিনলে কত দাম দেবে।

বেগুন-ওয়ালা অনেক পরীক্ষা করে ঐ প্রস্তরের বদলে নয় সের বেগুন দিতে রাজী হয়েছিল।...

বেগুন-ওয়ালার কাছ থেকে সে এক ডাল-ওয়ালার কাছে গিয়ে আবার সেটিকে যাচাই করল। ডাল-ওয়ালা তাকে একশ টাকা দিতে রাজী হল।

সেখান থেকে সে গেল এক বড় কাপড়-ওয়ালার কাছে। কাপড়-ওয়ালা হীরক খণ্ডটিকে চিনতে পেরে লক্ষ টাকা মূল্য দিতে রাজী হল।

কিন্তু দৈবক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তে অপর একজন জহর-ব্যবসায়ী সেদিকে আসছিল। তাকে দেখেই প্রথম জহুরী তাড়াতাড়ি হীবকটিকে জুতার মধ্যে, পায়ের নীচে লুকিয়ে ফেলল। পরে, যখন সেটিকে জুতার মধ্য থেকে বের করা হল তখন দেখা গেল যে হীরকখণ্ডটির একাংশ ফেটে আলাদা হয়ে গেছে।

জহুরী তখন দুঃখ করে হীরকটিকে বললে,—'এ কিরে! যখন বেগুন-ওয়ালা, ডাল-ওয়ালা পাথরে ঠুকে ঠুকে তোকে পরীক্ষা করছিল তখন তোব কোন জায়গায় কিছু হল না। আর আমি সামান্য একটু চাপ দিয়ে জুতার মধ্যে রেখেছিলাম বলেই তুই এমন করে ফেটে গেলি!'

হীরকখণ্ড তখন গভীর বেদনায় বলেছিল,…'ছাখ, ওরা আমাকে চেনে না, জানে না। ওরা ব্যবসা করে অতি সাধারণ বস্তু নিয়ে। সেজন্য ওদের আঘাতে আমার কোন দুঃখ হয় নি। কিন্তু তুমি নিজে জহুরী হয়ে আমাকে চিনলে না, জুতার মধ্যে পায়ের নীচে চেপে চরম অপমান করলে—এই দুঃখেই আমার বুকটা ফেটে গেল।'…

কাজেই ছাখ্, বললেন রামকৃষ্ণ, অন্যে যাই বলুক, তাতে আমি কিছু মনে করতাম না, দুঃখও পেতাম না। কিন্তু তুই নিজে পাকা

জহুরী হয়ে আমার সব দর্শনকে ভুল বলে উপেক্ষা করলি। আমাকে পাগল ভাবলি। এ দুঃখ কি আর রাখবার জায়গা আছে আমার ?…

বস্তুত, এইভাবে গুরু-শিষ্যের অপূর্ব সম্বন্ধ দান ও গ্রহণের বিচিত্র লীলার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সহজে নয়, দু'চার দিনে নয়। তারপর এ প্রক্রিয়ারই চরম উৎকর্ষে নিঃশেষ আনুগত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে আত্মনিবেদন করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ।

বলেছিলেন, 'শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।'

বলেছিলেন,…'দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে।
তব গতি নাহি জানি, মম গতি তাহাও না জানি,
কেবা চায় জানিবারে ?'
অতি বিচিত্র এবং মধুর সে আখ্যায়িকা।…

এরপর অতি অল্পকালের একটি ব্যবধান।

সে ব্যবধানের অন্তে কাশীপুরের এক উদ্যান-বাটীতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট—মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ গভীরতায়—সমাধিযোগে দেহত্যাগ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। দেহরক্ষার অল্প কয়েকদিন পূর্বে যুগ-প্রয়োজন সাধনের গুরু দায়িত্ব ও নিভৃত কৌশলটি নরেন্দ্রনাথকে দান করে বলেছিলেন,—'আজ আমার যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তি দিয়ে মায়ের অনেক কাজ করবি। জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করবি।'

তাঁর নিজ অলৌকিক তপঃশক্তির সর্ব উত্তরাধিকার নরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দেবার এবং স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করবার করুণ কাহিনী তদীয় জীবনাখ্যায়িকায় সবিস্তার উল্লিখিত রয়েছে।

বলা বাহুল্য, এরপর নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইদের জীবনে গভীর হতাশা এবং দুঃখের এক কৃষ্ণপক্ষই যেন সমাগত হয়েছিল।

হায়! যাঁকে কেন্দ্র করে, যাঁর পূত চরিত্রটিকে আদর্শরূপে অবলম্বন করে জীবনের সকল আনন্দোৎসবের আয়োজন, তিনিই সহসা কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন! সমস্ত বুক জুড়ে তাই তখন শুধু এক করুণ এবং অবিমিশ্র হাহাকার উঠেছিল। মনে হয়েছিল সে দুঃখের চাপ যেন আর সহ্য করা যায় না, তার যেন আর শেষ নেই!

আর, এরই মধ্যে কয়েকজন গুরু ভাইকে নিয়ে বরাহনগরের এক নিভৃত অংশে, জীর্ণ একটি ভূতের বাড়ীতে প্রথম মঠস্থাপন করলেন নরেন্দ্রনাথ এবং নূতন যুগের ঋত্বিকদের নিয়ে সূচনা করলেন বিপুল সাধন-যজ্ঞের। সে যাগ-ব্রতের কঠোরতারও যেন তুলনা মেলে না।...

ধ্যানে-উপাসনায়, পাঠে-অলোচনায়, অর্ধাহারে-অনাহারে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কোথা দিয়ে যেতে থাকল তার আব হুঁশ্ রইল না। তপস্যার যজ্ঞাগ্নি জ্বলতে লাগল অনির্বাণ, কীর্তনের উচ্চ-নিনাদ, মন্ত্রের সুগম্ভীর আরাব,—ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকল দিকে দিকে। অবিশ্রাম শাস্ত্রালোচনায় সরগরম হয়ে উঠল জীর্ণ মঠবাটী। অতন্দ্রিত রজনীর দীর্ঘ প্রহরগুলি অতিবাহিত হতে থাকল শুধু গভীর ধ্যানতন্ময়তায় আর অপ্রাকৃত উপলব্ধিতে।

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—এই আদর্শে কৃত-সঙ্কল্প তরুণ যোগীরদল নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বোধকরি নবযুগ-রচনার দুশ্চর ব্রতউদ্‌যাপনে একেবারে মগ্ন হয়ে গেল, ডুবে গেল।

একদিন, দু'দিন নয়—এক বৎসর, দু'বৎসরও নয়।

১৮৮৬ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পবিব্যাপ্ত দীর্ঘ একাদশ বৎসর কাল—অব্যাহত চলেছিল সে বিরাট সাধনযজ্ঞ,...প্রথমে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বরাহনগরে, তারপর আর একটি ভাড়াটে বাড়ীতে,

আলমবাজারে। অবশ্য নরেন্দ্রনাথের পক্ষে এ দীর্ঘ সময় একস্থানে বসে থাকা সম্ভব হয় নি।

তপোবৃদ্ধ ভারতবর্ষের বহু কল্প-সঞ্চিত সন্ন্যাস-সংস্কার অল্পদিন মধ্যেই আকর্ষণ করতে শুরু করেছিল নরেন্দ্রনাথকে—নিঃসঙ্গ, অনিশ্চিত জীবনের পরম ঈশ্বর-নির্ভরতার দিকে। তাছাড়া, এই বিশাল উপমহাদেশের শত তীর্থক্ষেত্রে সত্যের যে বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে যুগে যুগে, সিদ্ধকাম মহাপুরুষগণের পদরজে তাঁরা যে অমরত্ব লাভ করেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, প্রখ্যাত হয়েছে সমগ্র পৃথিবীতে—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত—গাঙ্গেয় উপত্যাকায়, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, কৃষ্ণা, গোদাবরীর তীরে তীরে—তাদেব সেই পতন-অভ্যুদয়ের অনবদ্য কাহিনী,—তাদেরও আকর্ষণ তীব্র হয়ে এইকালে তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ফলে, বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠার দু'বৎসর কাল পরেই ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে পরিব্রাজক বেশে, রিক্তহস্তে—একদিন অকস্মাৎ তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত-তীর্থের অন্তহীন পায়ে চলার পথে।

*   *   *   *

হিমশীতল হিমগিরির গুহায় গুহায়, মরুভূমির কঠিন-কঠোর ঊষরতায়, পুণ্যশ্লোক মনস্বিগণের পদরেণু-পূত তীর্থে তীর্থে এরপর কেটেছিল তাঁর দিব্য জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-মণ্ডিত, তপস্যা-সমৃদ্ধ পাঁচবৎসর কাল সময়। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ এর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

বদরিকাশ্রমের দুর্গম তীর্থ থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত থেকে পশ্চিমাঞ্চলতীর্থ-দ্বারকা, পায়ে হেঁটে হেঁটে অতিক্রম করলেন তিনি।

রাজা-মহারাজার মর্মর প্রাসাদ থেকে দীনের পর্ণকুটীর, ভিক্ষুকের

শেষ-আশ্রয়, বৃক্ষতল বা পথপ্রান্ত থেকে সাধুর কুঠিয়া বা পর্বতগুহা, সর্বত্র বাস করলেন নরেন্দ্রনাথ।

এই বিশাল ভারতের বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে যুগে যুগে কত না জাতি, কত না ধর্ম

'দুর্ব্বার স্রোতে
এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।'

আবার তারই পাশাপাশি—কত না ভাষা, কত না বিচিত্রতা বাস করে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে।

কি তাদের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়? কি তাদের সাধনা ও আধ্যাত্মিক সংকল্প? কোন্ মহান পরিণতির দিকে এগিয়ে চলবার অমরমন্ত্র আবিষ্কার করেছে ভারতবর্ষ তার সহস্র সহস্র বৎসরের অক্লান্ত সাধনা ও তপস্যায়?

আবার, কোন্ মহাপাপে আর্যবংশধর ভারত-ভারতী দারিদ্র্যের, কুসংস্কারের ও অজ্ঞানতার গভীর পঙ্কেই বা নিমজ্জিত হয়েছে আজ?

প্রীতি ও মৈত্রীর জন্মতীর্থে এত হিংসা-উন্মত্ততা এল কোথা থেকে? এইসব জানবার জন্য, বুঝবার জন্য…

তপোবৃদ্ধ, প্রাচীন এই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের নিগূঢ় মর্মকথা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করবার জন্য…

এবং নিজ পুণ্য জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণার স্পর্শলাভে ধন্য হবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষায়, সমগ্র দেশ, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম —পরিভ্রমণ করলেন বিবেকানন্দ, নগ্নপদে, পরিব্রাজকের দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে নিয়ে।

আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের নিগূঢ় রহস্য অধিগত করলেন তপস্যায়, শাস্ত্রের দুর্ভেদ্য জটিলতা ছিন্ন করলেন পাঠে, আলোচনায় এবং গভীর মননশীলতায়।

সর্বোপরি, প্রকৃত ভারতবর্ষ—যে-ভারতবর্ষ দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, গ্রামাঞ্চলের নিভৃত নিরালায় সর্বভাবে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছে, তাকে চিনলেন প্রত্যক্ষ সংযোগে, তার বাস্তব রূপ দেখলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়।

উপলব্ধি করলেন কোথায় তার মর্মবেদনা, কোথায় তার জীবন-প্রবাহের যথার্থ উৎসমুখ।

এইরূপ বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্যে কাটল দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল।

কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনায়, কত বিচিত্র মনোমুগ্ধকর কাহিনীতে, কত দুঃখ-ক্লেশের মর্মান্তিক সংঘাতে, আবার কত রাজোচিত সম্মানের উচ্ছলতায় যে সমৃদ্ধ ছিল তাঁর এই কালের পরিব্রাজক-জীবনের দিনগুলি, ক্ষুদ্র-পরিসর বর্তমান আখ্যায়িকায় তার বিশদ পরিচয় প্রদান সম্ভব নয়।

ভাষার রেখাঙ্কনে সীমাহীন আকাশ-গাত্রে ছন্দ রচনার দুরাশাও আমরা পোষণ করিনা, শুধু প্রসঙ্গক্রমে দু'একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করব।

কিন্তু তার পূর্বে একালের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আর একটি কথার বিবৃতি এখানে প্রয়োজন।

ভারতের সুপ্রাচীন ইতিহাসে বিন্ধ্যপর্বতের বৈশিষ্ট এবং তাৎপর্য স্বীকৃত। অসংখ্য পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার সঙ্গে সে পর্বতমালার অক্ষয়স্মৃতি বিজড়িত।

এর উত্তরাংশে গাঙ্গেয় উপত্যকার বিস্তীর্ণ সমভূমি—স্তরে স্তরে উন্নীত হয়ে হিমালয়ের সানুদেশের সঙ্গে মিশেছে। আর তারই মধ্যে, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরসমূহের অন্তরালে, সিদ্ধকাম ঋষিগণের পদধূলিপূতঃ অগণ্য তীর্থক্ষেত্র।

একদা মহাকাব্যের যুগে মহামুনি লোমশ বনবাসী পঞ্চপাণ্ডবকে

তীর্থভ্রমণে প্রবুদ্ধ করেছিলেন। পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,—যুধিষ্ঠির, তোমার এই দীর্ঘ বনবাস কালে ভারতবর্ষের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় সাধন কর। প্রত্যক্ষ সংযোগে উপলব্ধি কর তার জীবনদর্শনের নিগূঢ় মর্মকথা। আর সে নির্দেশেরই ফলে, দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর কাল ধরে পঞ্চপাণ্ডবের উত্তর-ভারত পরিক্রমা, যার অনবদ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে মহাভারতের 'বনপর্ব' অধ্যায়টিতে।

আবার, তারও পূর্বে, রঘুকুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস-জীবন যাপিত হয়েছিল বিন্ধ্যপর্বতের অপরাংশে, গোদাবরী, নর্মদা, কাবেরী-বিধৌত দক্ষিণভারতে।

তারও অনুপম বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখা যাবে রামায়ণের 'অরণ্য কাণ্ড'টিতে।

স্বামীজীও যেন সেই প্রাচীন ধারারই অনুসরণে প্রথমার্ধে উত্তরভারতে এবং দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণভারতে তাঁর পরিব্রাজক জীবনের পাঁচবৎসর কাল যাপন করেছিলেন।

বিচিত্র কারণপরম্পরায় সেই দুই কালের অনুসন্ধিৎসা এবং অভিজ্ঞতা বহুলাংশে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল। জ্ঞানচক্ষু এবং প্রেম-চক্ষুর সম্যক উন্মীলনের যেন সেই দুইটি বিশিষ্ট কাল।

প্রথমপর্যায়ে, অর্থাৎ ১৮৮৮ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত যে-কাল, সেই কালে নিজ অন্তর-জীবনের তীব্র আধ্যাত্মিক পিপাসার সম্যক উপশান্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নিজস্ব ধ্যান-সঙ্কল্পের যে স্বরূপ, সেটির নির্ণয়-প্রয়াসই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

আর দ্বিতীয়পর্যায়ে, ভারতবর্ষের অতি-বাস্তব মৃন্ময় রূপটির সঙ্গেই যেন প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। বড়ো দুঃখ এবং বেদনাময় ছিল সে পরিচয়। স্বামীজীর বিশাল-হৃদয় সে পরিচয়ের ফলে এককালে যেন তীব্র বেদনায় আর্ত হয়ে উঠেছিল, সমাধি-দ্বারে

'চাবি লাগাবার যে কথা দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল তার তাৎপর্যও যেন এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক। আমরা তাঁর উত্তরভারত পরিভ্রমণের কথা বলছিলাম, সে কথায়ই ফিরে যাচ্ছি। সেই ভ্রমণকালে বহু বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তাঁর জীবনে।...

একটি ঘটনা কাশীধামের, স্বামীজী তখন কাশীতে।

সেই সময় একদিন কাশীর উপকণ্ঠস্থ নির্জন এক রাজপথে অকস্মাৎ তিনি কতিপয় বিশালাকৃতি বাঁদর কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। স্থানটি সম্পূর্ণ জনশূন্য ছিল, সহর থেকে বেশ খানিকটা দূরেও ছিল। তাছাড়া, কাশীর বাঁদর নানাভাবে মানুষের উপর উপদ্রবও করে থাকে। তাই শঙ্কিত মনে স্বামীজী দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন সে দিন। কিন্তু তিনি যতই দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন বাঁদরগুলিও তাঁকে আক্রমণ করবার জন্য ততই তাঁর দিকে বেগে ধাবিত হচ্ছিল। বেশ খানিকটা শঙ্কিত হয়েছিলেন স্বামীজী।

অবশেষে যখন সেগুলি তাঁকে প্রায় ধরে ধরে, তখন অকস্মাৎ পিছন থেকে কে যেন তাঁকে আহ্বান করে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল,—

'ফিরে দাঁড়াও—পালিয়ো না।'

সে আহ্বান-ধ্বনি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে দৃপ্ত-ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ালেন স্বামীজী আর মুহূর্তে বাঁদরগুলিও ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল।

পরবর্তীকালে, নিউইয়র্কে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই ছোট ঘটনাটি তিনি উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, সেদিন সেই সামান্য ঘটনাটি থেকে আমি এই মহৎ শিক্ষা লাভ করেছিলাম যে, বিপদের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, সকল দুর্বলতার বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করে থাকতে হবে, তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ভয় বিদূরিত হবে। বলেছিলেন :

'Face nature. Face ignorance. Face illusion! Never fly.'

এই কালের তাঁর জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—গাজীপুরের প্রসিদ্ধ মৌনীসাধু পওহারিবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং যোগ-সাধনের উৎকর্ষে সমাধি-সমুদ্রে এককালে নিমগ্ন হয়ে যাবার দ্বিতীয় ব্যর্থ-প্রয়াস।

কেমন করে পওহারিবাবার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁর নিকট দীক্ষালাভের জন্য স্বামীজী উন্মুখ হয়েছিলেন এবং কেমন করেই বা শ্রীরামকৃষ্ণের অশরীরী মূর্তি অশেষ অনুনয়ে তাঁকে দীক্ষা-সঙ্কল্প থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, তদীয় বিস্তৃত জীবন-ইতিহাসে সে বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

একদিন, দু'দিন নয়, ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ সাতাশ দিন দর্শন দিয়ে, করুণ নিঃশব্দ অনুবোধ জানিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেবার তাঁকে দীক্ষা-গ্রহণ-সঙ্কল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেদিনই তিনি দীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করতেন—ঠিক তার পূর্ব-রজনীতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচিত্র দর্শন লাভ করতেন স্বপ্নে। দেখতেন, স্নেহ ও অনুনয়ের অতি মর্মস্পর্শী এক আবেদনের দৃষ্টিতে সে দিব্যপুরুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। সে দৃষ্টির অন্তরালে কী গভীর প্রত্যাশা, কী অবাচ্য সকরুণ ইঙ্গিত। ক্রমান্বয়ে সাতাশ দিন এমনি হবার ফলে পওহরাবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণের অভিপ্রায় শেষ পর্যন্ত স্বামীজী ত্যাগ করেছিলেন। সাধারণে প্রচলিত ধারণা এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভক্তিযোগ ও শরণাগতি-সাধনা আর স্বামীজী-প্রবর্তিত কর্মযোগ এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবা বহুলাংশে পরস্পর বিরোধী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ ছিল ভগবানের নামে ও চিন্তায়, স্মরণে ও ধ্যানে জীবন অতিবাহিত কর। দুর্লভ মনুষ্যজন্মে ঈশ্বরলাভই একমাত্র কাম্যবস্তু, একমাত্র সাধ্যসামগ্রী। রাজদ্বারে যদি কখনো উপস্থিত হতে পার তবে তুচ্ছ, নশ্বর সামগ্রীর আকাঙ্ক্ষা করোনা, পার্থিব সম্পদের প্রার্থনা জানিও না।

আর স্বামী বিবেকানন্দের অনুশাসনে কর্মই ছিল প্রধান, অন্ততঃ ভারতবর্ষের জটিল জাতীয় জীবনে।

দরিদ্রনারায়ণের সেবা কর, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ কর। 'সঙ্ঘশক্তি কলৌ যুগে'। আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য দেশ-মাতৃকাই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য হোক।

বাহ্যতঃ সত্য হলেও এ ধারণা সবাংশে সত্য নয়। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে এ ধারণার বিপরীত বিন্দুতেই যথার্থ সত্যটি নিহিত। দেখা যাবে যে ধ্যানসিদ্ধ বিবেকানন্দকে বিরাট কর্মযজ্ঞে পূর্ণাভিসিক্ত করবার দুরূহ প্রচেষ্টা থেকেই গুরুশিষ্যে দীর্ঘ ছয়বৎসরব্যাপী অপূর্ব লীলাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি।

শিষ্যের স্বপ্ন ছিল যোগ-সংসিদ্ধির উৎকর্ষে ধীরে ধীরে সমাধি-সায়রে একেবারে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া। আর শ্রীগুরুর ব্রত ছিল যুগ-প্রয়োজনে এই সত্যটি শিষ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া :

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বতরং কৃতম্॥

কারণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত-জর্জর পৃথিবীতে আজ প্রশান্তচিত্ত একটি বিরাট পুরুষের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে।

দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমির বুকে একটি শত-যোজন-প্রসারিত-শাখা পান্থপাদপের আবশ্যক অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব,

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

আর, সেই অন্তর্দ্বন্দ্বেরই অবসান হয়েছিল গাজীপুরের উদ্যানবাটীতে পৌনঃপুনিক স্বপ্নদর্শনের ফলস্বরূপে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যত কথিত ও অকথিত উদ্বেগ ছিল সে সবেরও যেন সম্যক নিরসন হয়েছিল চিরদিনের মত।

এরপরই রাজপুতনা ও দাক্ষিণাত্য। সে প্রদেশ অতি বিস্তৃত ভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন স্বামীজী পরিব্রাজক জীবনে এবং তারও পরবর্তী জীবনে। এখানে অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে একালের অর্থাৎ, পরিব্রাজক জীবনেরই আরও দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

একবার অতি রুক্ষ এক গ্রীষ্মকালে, উত্তরাখণ্ডের 'পিলুঘাট' নামক স্থানে নগ্নপদে ও একেবারে রিক্তহস্তে পৌঁছেছিলেন স্বামীজী। ট্রেণের সমস্ত পথটি শুষ্ক ও কঠিন উত্তাপে অত্যন্ত কষ্টে কেটেছিল। অর্থের অভাবে সামান্য পানীয় জল সংগ্রহ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সহনাতীত প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, যখন মানুষ অর্থ দিয়েও সহজে জল সংগ্রহ করতে পারছে না, তখন এক রিক্ত, পথচারী বৈরাগী যে জল সংগ্রহ করতে পারবে না—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঐ কক্ষে সেদিন সে-অঞ্চলেরই একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বণিকও যাত্রী ছিল। নিঃসম্বল সাধুর অমন দুরবস্থা দেখে তার কৌতুকবোধের যেন অবধি ছিল না। নানাপ্রকার শ্লেষ ও বিদ্রূপ বাক্য প্রায় সারাপথই সে স্বামীজীর প্রতি প্রয়োগ করেছিল।

ক্রমে গাড়ী 'পিলুঘাটে' পৌঁছাল। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, মধ্য আকাশের সীমাহীন শূন্যতা থেকে প্রচণ্ড সূর্য যেন মুহুর্মুহুঃ অগ্নিবৃষ্টি করছিল পৃথিবীর উপর। তৃষ্ণায় এবং ক্ষুধায় একান্ত পীড়িত হয়েও স্বামীজী অর্থাভাবে কিছুই সংগ্রহ করতে পারলেন না। না জল, না খাদ্য। এমন কি স্টেসনঘরের ছায়াতেও তাঁর একটু স্থান হল না।

ইতিমধ্যে বণিক ব্যবসায়িটি নানাবিধ আহার্য বস্তু নিয়ে, শীতল পানীয় নিয়ে আহারে বসেছেন এবং অর্থোপার্জনে মন না দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সাধু হবার অনিবার্য পরিণাম সম্বন্ধে নানা তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে চলেছেন। উদ্দেশ্য স্বামীজীকে আরও ব্যঙ্গ করা, আরও তাচ্ছিল্য দেখান।

কিন্তু অকস্মাৎ, এরই মধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, সেটি যেমনি অপ্রত্যাশিত, তেমনি বিচিত্র। সহসা দেখা গেল দূরে একজন অপরিচিত লোক আহার্য, পানীয় এবং একটি আসন নিয়ে দ্রুতপদে স্টেসনের দিকে এগিয়ে আসছে। স্টেসনে পেঁাছে কিছুক্ষণ অনুসন্ধানীদৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে স্বামীজীকে দেখতে পেল এবং মুহূর্তে তাঁর নিকটে এসে করজোড়ে তাঁকে ঐ খাদ্য ও জল গ্রহণ করতে বিনম্র অনুরোধ জানাল।

বলল, এ আমার দেবতার আদেশ, রামজীর আদেশ। আমি ঘুমিয়েছিলাম। তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন। স্থান নির্দেশ করে বললেন—'ঐ স্থানে আমার এক পরম ভক্ত অনাহারে ও তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছে। তুমি শীঘ্র যাও, তার সেবা কর, তাকে তৃপ্ত কর'।

স্বামীজী স্তম্ভিত হলেন, ভগবানের অপার করুণার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পেয়ে চোখে তাঁর জল এসে গেল।

আর সেই ব্যবসায়ী বণিকটি?

স্বামীজীর পায়ে ধরে তখন তার কী কঠিন অনুশোচনা, কী করুণ অশ্রুপাত! এই মায়ার সংসারে মাঝে মাঝে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে!...

আর একটি ঘটনা ঘটেছিল ক্ষেত্রীতে।

স্বামীজী তখন সেইখানে। ক্ষেত্রীর রাজা অজিতসিং ইতিপূর্বে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর আশীর্বাদে অপুত্রক তিনি সদ্য একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। ফলে, পুত্রের জন্মোপলক্ষ্যে-অনুষ্ঠিত উৎসবে ভক্তিমান রাজা ঐকান্তিক অনুরোধ জানিয়ে স্বামীজীকে ক্ষেত্রীতে আনয়ন করেছেন।

উৎসবে নৃত্য-গীত, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির বিপুল আয়োজন, প্রভূত সমারোহ। আলোক-সজ্জার বিচিত্রসাজে সুসজ্জিতা নগরী।

সেদিন, নৃত্য-গীতের এক বিশেষ সভায় স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে আনন্দ দেবার জন্যই বোধ করি এক বিখ্যাত নর্তকী নৃত্য

ও গীত শুরু করেছিল। রাজার পার্শ্বে এক রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন স্বামীজী।

কিন্তু বাইজী নৃত্য শুরু করতেই মুহূর্তে স্বামীজী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসী তিনি, বাইজীর নৃত্য-গীতে যোগদান তাঁর ধর্ম নয়, তাঁর পক্ষে শোভন নয়।

স-পারিষদ অজিতসিং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে স্বামীজী ধীর পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হলেন দরজার দিকে। কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রস্থান করবেন তিনি। অকস্মাৎ পশ্চাৎ থেকে নর্তকীর আর্তকণ্ঠের তীক্ষ্ণ মর্মভেদী স্বর তাঁর কর্ণে এসে আঘাত করল।

গান গাইছে ব্যথাতুরা নর্তকী তাকেই লক্ষ্য করে

প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো
সমদর্শী হৈ নাম তুম্‌হারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নহী হোয,
দুহুঁ এক কাঞ্চন করো।
এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভরো।
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো।
এক মায়া এক ব্রহ্ম কহতো সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞান সে ভেদ হৈ জ্ঞানী কাঁহে ভেদ করো।

মুহূর্তে ব্রহ্মজ্ঞ স্বামীজীর ব্রহ্ম-চেতনা জাগ্রত হল—যেমন হয়েছিল বহু শতাব্দী পূর্বে একদা বেদান্ত-কেশরী আচার্য শঙ্করের—কাশীর রাজপথে, নীচবংশোদ্ভব এক ভাঙ্গড়ের মুখে তত্ত্বজ্ঞানের পরম উপদেশ শ্রবণ করে, 'একই সূর্য গঙ্গাজলে, মদের বোতলে।'

ফিরে এলেন স্বামীজী সভাগৃহে। চোখে তখন তাঁর করুণার অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হয়েছে, অন্তর আপ্লুত হয়েছে প্রেমের এক বিচিত্র অনুভূতিতে। অকুণ্ঠ আশীর্বাদে ধন্য করলেন সে নর্তকীব অভিশপ্ত জীবন। তাঁর বেদান্তজ্ঞান এবং সর্বজীবে অভেদবুদ্ধিও পরীক্ষীত হল বাস্তবের কষ্টি পাথরে।

* * * *

এই কালেরই কোন এক সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সাক্ষাৎ হয়েছিল বোম্বাই প্রদেশের একাংশে। পূর্বাশ্রমেব নাম ধরে স্বামীজী তাঁকে সস্নেহে 'হরিভাই' বলে সম্বোধন করতেন। বলেছিলেন,—'হরিভাই, ধর্ম করতে বেরিয়ে, সাধু হয়ে, আর কিছু হয়েছে কিনা জানি না—কিন্তু বুকটা আমার অত্যন্ত বড় হয়েছে। অন্তবে তীব্র ক্ষোভ এবং অনুশোচনার আর যেন অবাধ খুঁজে পাচ্ছিনা। এ-দেশের দুঃখ দুর্দশা দেখে দেখে আমার পেটের ক্ষুধা এবং চোখের ঘুম দুই-ই ঘুচে গেছে।'

এমনি আরও অসংখ্য—গল্পের মত রোমাঞ্চকর, কত ঘটনাই না এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু এ আখ্যায়িকার অপরিসরে সেটি সম্ভব নয়। উৎসুক পাঠক তাব বিস্তৃত জীবনী পাঠ করলে তাদের সম্যক পরিচয় পেতে পারবেন।

ফলকথা, এমনি করে বহু বিচিত্র ঘটনা, বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং কঠোর সাধন-তপস্যার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর পরিব্রাজক জীবনেব দীর্ঘ দিনগুলি, ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সে-কথা পূর্বে বলেছি।

তারপর একদিন সমগ্র ভারত-পরিক্রমা শেষ করে যদৃচ্ছা ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ ভারতের শেষ-তীর্থ 'কন্যাকুমারী'তে উপনীত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

প্রাচীন পৌরাণিক ইতিবৃত্তে কথিত আছে যে একদা এক

অপাপবিদ্ধা কুমারীকন্যা দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে আকাঙ্ক্ষা করেছিল। দেবতা বলেছিলেন, দক্ষিণ ভারতে যাও। সেখানে সমুদ্রতীরে বসে নিরলস তপস্যা কর। তপস্যা পূর্ণ হলে, আত্মনিবেদন সর্বাঙ্গীন হলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। তারপর কত যুগ, কত মন্বন্তর অতিক্রান্ত হল, ঋতু-উৎসবের অভিষেক-বারি কতবার সিঞ্চিত হল পৃথিবীর বুকে। কিন্তু সে কুমারীকন্যার তপস্যা আর পূর্ণ হল না। হিমালয়ের নিভৃত গহন পরিত্যাগ করে দেবাদিদেবও আর তাই উপস্থিত হলেন না তাঁর দ্বারে।

সেইহেতু আজও ভারতের চিরন্তন তপস্যার প্রতীকরূপে, শুভ্র শুচিতার বিগ্রহরূপে সে কন্যার তপস্যা চলেছে ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে, কন্যাকুমারীর মন্দিরে। আর আজ তারই পাদমূলে ভারতের শেষ উপলখণ্ডটি, যে উপলখণ্ডটি উত্তরকালে 'বিবেকানন্দ-প্রস্তর' নামে অভিহিত হয়েছে, তারই উপর বসে পুরঃ-প্রসারিত ভারত-ভূখণ্ডের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন সেই প্রেমিক-সন্ন্যাসী।

যুগ যুগ ব্যাপ্ত প্রাচীন ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিতে কত বিচিত্রভাবের আবেগেই না উদ্বেলিত হল তাঁর বিশাল হৃদয় সেই দুর্লভ মুহূর্তটিতে।

যে প্রাচীন, মৌনী ভস্মাচ্ছাদিত ভারতবর্ষ একদা সাধনা ও তপস্যার বলে যুগপৎ ভেদ করেছিল জন্মমৃত্যুর রহস্য, সৃষ্টি করেছিল বেদ, উপনিষদ্, গীতা—

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্ব তীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো মনুঃ॥

যে দেশের সাধককুল জ্ঞানের চরম শিখরে উঠে একদিন নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরীর মত জগদ্বিখ্যাত মহাবিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেছিল,…

প্রাচুর্যে, আনন্দে ও সৃষ্টিকৌশলে একদা যে-দেশ জগতের আদর্শ ছিল, শীর্ষস্থানীয় ছিল, আজ দুঃখে, দারিদ্র্যে, কুসংস্কারে ও অজ্ঞানে—অধোগতির কোন্ অতল গহ্বরে নেমেছে সে ?

যেখানে অফুরন্ত প্রাচুর্য ছিল—সেখানে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া পড়েছে, যেখানে একদা সত্ত্বগুণের প্রভূত প্রকাশ ছিল—সেখানে দাসত্ব ও জড়তার ঘোর তমোগুণ আত্মপ্রকাশ করেছে। অন্নহীন, গৃহহীন, শিক্ষাহীন—অগণ্য নরনারীর সে এক করুণ, নৈরাশ্যব্যঞ্জক ছবি! সর্বব্যাপ্ত শুধু যেন অন্ধকার আর অন্ধকার।

চোখ ফেটে তপ্ত অশ্রু নির্গত হ'ল তাঁর। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভিতরের সিংহ যেন গর্জন করে উঠল। কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য, মাতৃভূমির কলঙ্ক স্খালনে জীবনপাত করবার জন্য অন্তর তাঁর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন কুমারী কন্যার অনন্ত তপস্যার গভীরতা, ভারত-আত্মার অমর, অক্ষয় মহিমা।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

এ নির্দেশ শতযুগ, মন্বন্তর পূর্বে তাঁরই মত যুগপ্রতিনিধির উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছিল। করবেন, সংগ্রামই করবেন তিনি। অশিক্ষা, কু-সংস্কার আর দারিদ্র্য। এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে একক সংগ্রামেই তিনি অবতীর্ণ হবেন।…

জাগবে, ভারতবর্ষ জাগবে!

আবার পরক্ষণেই দেখলেন, দূর সমুদ্রের নিঃসীম জলরাশির উপর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলেছে দূরতর, গভীরতর সমুদ্রের দিকে। ইঙ্গিতে আহ্বান করে সে ছায়া-মূর্তি বলছে যেন তাঁকে—

দূর দিক্‌চক্রবাল পেরিয়ে, সপ্তসমুদ্রের বেলাভূমি অতিক্রম করে

নূতন পৃথিবীর কেন্দ্রে চলে যাও তুমি। সেখানে ভারতবর্ষের মহিমা ও সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বার্তা ঘোষণা কর, প্রচার কর। মাতৃভূমির সর্ব যুগের ঋষিকুল আশীর্বাদ করবেন, শক্তি দেবেন তোমাকে।

ইতিমধ্যে অবশ্য প্রস্তাবিত বিশ্ব ধর্ম-মহাসম্মেলনের কথাও নানা ভাবে নানা সূত্রে সুদূর আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে। স্বামীজীও শুনেছেন সে সংবাদ।

সুতরাং সঙ্কল্প স্থির হতে বিলম্ব হল না। দূরে বিলীন-প্রায় মহান গুরুর অশরীরী মূর্তির পানে তাকিয়ে আপন মনেই বললেন বিবেকানন্দ--

হাঁ প্রভু, আমি যাব। দূর অব্ধিপারে স্বাধীন দেশেই যাব। আমাদের অনবদ্য আধ্যাত্মিক সম্পদ, বেদান্তের সার্বভৌম ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করে আমার হৃতসবস্ব মাতৃভূমির লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করব। সেখান থেকে বিনিময়ে আনব অর্থ, আনব বৈজ্ঞানিক কৌশল, আনব সংগঠনী শক্তি। আমার দুঃখিনী জন্মভূমির চোখের জল মোছাব আমি।

যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্বো যে দেবেভ্যা জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে।

যিনি দেবতার জন্য চৈতন্য সম্পাদন করেন, যিনি দেবগণের পুরোহিত, যিনি দেবগণের পূর্বজাত—আমি সেই বেদ-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। হে দেবতা, তুমি আমার সহায় হও, আমাকে আশীর্বাদ কর।

দুই

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে।

ভারতবর্ষের বুকে, কালের রথে ধ্বজা উড্ডীন করে সমাগত সেই বিশেষ বৎসরের চিহ্নিত দিনটি।

বোম্বাই উপকূল থেকে আমেরিকার অজ্ঞাত তটভূমির উদ্দেশে সেইদিন যাত্রা করল জাহাজ—'পেনিন্সুলার'।

সে জাহাজের অন্যতম যাত্রী নিঃসঙ্গ, একক সন্ন্যাসী—স্বামী বিবেকানন্দ।

অপরিচিত নূতন মহাদেশ আমেরিকা। সেখানে, শিকাগো মহানগরীতে আহূত হয়েছে বিশ্ব-ধর্ম-মহাসম্মেলন। কিন্তু সে সম্মেলনে হিন্দুধর্মের কোন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হন নি,সে ধর্মের ঐতিহাসিকতা কিংবা গুরুত্ব বিষয়ে কেউ হয়ত চিন্তাও করেনি সেখানে।

তথাপি সেখানেই, তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনস্বীগণের সেই সম্মেলনেই,—সভ্যজগতের নূতন ও পুরাতন যাবতীয় ধর্মের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মুখেই, ভারতবর্ষের উদার, সার্বভৌম ধর্ম ও জীবন-দর্শন উপস্থাপিত করে মহান্ যুগব্রত উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হয়ে স্বামীজী যাত্রা করলেন।

সহায়হীন, সম্বলহীন, রাষ্ট্র ও সমাজের পৃষ্ঠপোষকতাহীন, একান্ত নিঃসঙ্গ তিনি, নির্ভর করেছেন শুধু নিজ সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং গুরুর শুভেচ্ছার উপর, শুধু সেই শাশ্বত আশ্বাস বাণীর উপর—

পার্থ নৈবেহ নামূত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

বৌদ্ধযুগের পর, কত দীর্ঘ শতাব্দীর অন্তে, ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষ থেকে সেই প্রথম যাত্রা করল ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত, ভারতের কাল্‌চারেল এম্বেসেডর—বহির্ভারতের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু হায়, ভারতবর্ষের কেউ জানল না, বাংলারও বিশেষ কেউ জানল না, এমন কি তাঁর প্রিয় গুরুভাইরাও কেউ জানলেন না সে সংবাদ। কেবল মাদ্রাজের কয়েকটি গুণমুগ্ধ, উৎসাহী যুবক তাঁকে সামান্য অর্থসংগ্রহ করে দিল, কেবল ক্ষেত্রীর রাজকর্মচারী মুন্সী জগমোহন টিকিট কেটে তাঁকে জাহাজে তুলে দিয়ে এল বোম্বাই বন্দরে।···যাত্রা করলেন স্বামীজী।

বোম্বাই বন্দর ছেড়ে ধীরে ধীরে জাহাজ দূর দিক্‌-চক্রবলয়ের অন্তরালে অদৃশ্য হতে থাকল···বিলীয়মান হতে থাকল ভারতবর্ষের বিস্তৃত তটরেখা, শ্যাম-সুন্দর পশ্চিমঘাট পর্বতের উচ্চ-নিচ শৃঙ্গমালা। বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্র ভেদ করে নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে শুরু হল দুর্জয় ও দুঃসাহসের অনিশ্চিত অভিযান।

বোম্বাই থেকে কলম্বো, তারপর পেনাঙ্‌।

পেনাঙ্‌ থেকে সিঙ্গাপুর। সেখান থেকে আবার চীনের উপকূল ছুঁয়ে ক্যান্টন হয়ে জাহাজ পৌঁছাল জাপানের অন্যতম বন্দরে, নাগাসাকিতে।

জীবনে প্রথম স্বাধীন দেশে পদার্পণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

গভীর ঔৎসুক্য ও কৌতূহল নিয়ে নবজাগ্রত জাপানের ওসাকা, কিয়েটো, টোকিও প্রভৃতি বিখ্যাত শহর দেখলেন তিনি।

কর্মব্যস্ত, সুস্থদেহ প্রগতিশীল তরুণ জাপান, আর তার ছবির-মত করে সাজান পরিচ্ছন্ন শহরগুলি স্বামীজীকে মুগ্ধ করল, তাঁর দৃষ্টি খুলে দিল।

আর চকিতে, কল্পনার ক্ষেত্রে ভেসে উঠল দূরদিগন্তের আর একটি

ছবি। দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট, রোগ ও শিক্ষাহীনতায় মলিন—দেশ-মাতৃকার একান্ত সকরুণ সে ছবি! অব্যক্ত বেদনা জাগ্রত হল তাঁর অন্তরে।

লজ্জায়, ক্ষোভে ও ধিক্কারে অধীর হয়ে এই সময় তাই অনেকগুলি দীর্ঘ চিঠি তিনি প্রেরণ করেছিলেন ভারতের তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করে জাপান থেকে। ভবিষ্যৎ ভারতের বিচিত্র স্বপ্নময় ছবিও তাদের মধ্যে চিত্রিত ছিল। পরবর্তীকালে সে সব ছবি স্পষ্টতর হয়েছিল, পরিচ্ছন্নতর হয়ে উঠেছিল।

তাঁর 'পত্রাবলী' গ্রন্থে প্রকাশিত অবিনশ্বর ও উদ্দীপনাময় সে-সব চিঠি ভারতের নব-জাগরণের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে অক্ষয় হয়ে আছে।

মনে হচ্ছে, অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল-পূর্ব্বে-উচ্চারিত সে-সকল তেজোগর্ভ বাণী দূর-প্রাচ্যের সূর্যরশ্মিরাঙা পর্বতগাত্রে প্রতিহত হয়ে আজও যেন ভারতবর্ষের আকাশে প্রতিধ্বনি তুলছে। আজও তার প্রাণদ ঝঙ্কার কান পেতে যেন আমরা শুনতে পাচ্ছি।

বলি চান দেশমাতৃকা···সহস্র, নিঃস্বার্থ ও তেজস্বী যুবকের জীবন বলি চান। হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ···এগিয়ে এস, বেরিয়ে এস!

Onward, Forward···

কুসংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে···অনড় জড়তার মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করে, বিচূর্ণ করে, 'পিঞ্জরাদিব কেশরী' নির্মেঘ আকাশের বিশুদ্ধ বায়ুতে ছুটে চলে এস। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।

তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

করি। পেছনে চেয়োনা। —অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদছে? কাঁদুক। তার জন্য পশ্চাদপসরণ করোনা। সামনে এগিয়ে যাও।—বদ্ধ ঘরের রুদ্ধ বাতায়ন খুলে দাও।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ—বিপুলা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ কর্মশালার দিকে। উপলব্ধিকর,—শুদ্ধমাত্র অপরিসীম উদ্যমে, সঙ্ঘশক্তিতে আর বৈজ্ঞানিক কৌশলে ক্ষুদ্র জাপান, সদ্য-জাগ্রত তরুণ জাপান—কেমন করে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিপুঞ্জের মধ্যে নিজের মর্যাদার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে অতি অল্প সময় মধ্যে।

এসে নিজ চক্ষে দেখে যাও এসব,—আর ধিক্কার দাও, সহস্র ধিক্কার দাও নিজেদের চরম অক্ষমতাকে···ধিক্কার দাও নিজেদের কূপমণ্ডুতাকে।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, পার যদি—বেশ ভাল করে এ-কথাটি অনুভব করে যাও যে,—

নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।

বুঝে যাও, নিরব নিষ্ঠার কোন্ মন্ত্রগুপ্তিতে মহৎ কার্য কীভাবে সাধিত হয়। খবরের কাগজের হুজুগ নয়, নামযশের প্রত্যাশা বা বুভুক্ষা নয়।

* * * *

জাহাজ কয়েকদিন মাত্র রইল জাপানে।

তারপর জাপানের বন্দর ছেড়ে, প্রাচীন গোলার্ধের তটভূমি

পশ্চাতে রেখে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করে সে এগিয়ে চলল নূতন গোলার্ধের দিকে—ইয়োকোহামা বন্দর থেকে ভ্যাঙ্কুবরের দিকে।···

ভ্যাঙ্কুবর। বৃটিশ কলম্বিয়াব বেলা-বন্দর ভ্যাঙ্কুবর।

প্রায় একমাস কালে সমুদ্রের বুকে বহুযোজন পথ অতিক্রম করে জাহাজ ধীরে ধীরে গিয়ে নোঙ্গর গাড়ল সেই বন্দরটিতে।

সেখান থেকে কানাডা হয়ে তিনদিন অবিশ্রাম রেলগাড়ীতে দীর্ঘ-পথ অতিক্রম করে—বহু নগর, জনপদ পার হয়ে—ভারতবর্ষ ছাড়বার প্রায় দুইমাস পরে পেঁীছালেন বিবেকানন্দ তাঁর বহু আশা ও কল্পনার ভাবী কর্মস্থান, শিকাগো মহানগরীতে,—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রায় মধ্যভাগে।

শিকাগো। অগণ্য, আকাশ-স্পর্শী, বিচিত্র হর্ম্যমালায় সুসজ্জিত ঐশ্বর্যময়ী মহানগরী শিকাগো। বর্ণে ও বৈচিত্র্যে—জীবনচাঞ্চল্যের সজীবতায় নিত্য মুখরিত শিকাগো!

ঋজু ও প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন ও নয়নাভিরাম রাজপথেব পাশে পাশে আলোকোজ্জ্বল বিপণি, আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে শ্যামশস্পাচ্ছাদিত মুক্ত উদ্যানবাটীতে শোভাময়ী মহানগরী শিকাগো।

সংসারানভিজ্ঞ, বালকস্বভাব স্বামীজী বিস্মিত হলেন, বিহ্বল হলেন।

অদূর ভবিষ্যতে ঐ নগরীর সঙ্গে তাঁর নিজ জীবনের কাহিনী যে চিরন্তন সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হবে, তা তখনো তাঁর কাছে একেবারে অজ্ঞাত হয়ে আছে। অনাগত ভবিষ্যতের রহস্যাবৃত গভীরতায় এক-কালে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে আছে সে বিচিত্র আখ্যায়িকা।

শিকাগোতে পৌঁছে নূতন অপরিচিত স্থানে কোনপ্রকারে একটা অতি সাধারণ হোটেলে ব্যবস্থা করলেন স্বামীজী বাসের ও আহারের। তারপর দু'একদিন মধ্যেই ধর্মমহাসভার সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু সংবাদ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন, আরও কয়েক মাস পরে এবং বৎসরের প্রায় শেষদিকে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে, শুরু হবে মহাসভার অধিবেশন।

আরও জানলেন, কোন বিশেষ রাষ্ট্রের বা ধর্মের যথাবিহিতভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া আর কাউকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করবার নিয়ম নয় সেখানে। সর্বোপরি, প্রতিনিধির নাম প্রেরণের শেষ তারিখও বহুদিন অতীত হয়েছে। সুতরাং আর কোন উপায় নেই, কোন আশাও বোধ হয় নেই।

একটি দুরতিক্রম্য বাধা নূতন করে যেন অকস্মাৎ মাথা উঁচু করে দাঁড়াল কার্যসিদ্ধির পথরোধ করে।

বিমর্ষ ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন স্বামীজী।

দূর বিদেশে এককালে নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় তিনি—হাতের সামান্য অর্থও শিকাগোর বিপরীত ব্যয়বাহুল্যে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। আমেরিকার দুর্জয় শীতের উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত তাঁর নেই। এদিকে তীব্রতম শীত এগিয়ে আসছে শনৈঃ শনৈঃ। অথচ, আরও দু'তিন মাস কাল সেখানে অপেক্ষা না করেও কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

দুর্যোগের ঘন অন্ধকার যেন গাঢ়তম হয়ে চারদিক আচ্ছন্ন করে এল। আশার ঈষৎ আলোকরেখাও যেন দিগ্বলয় থেকে নিঃশেষে মুছে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তথাপি ভাবলেন স্বামীজী—শেষ অবধি লড়াই করে দেখবেন তিনি, যে-কোন তৃণখণ্ড ধরে ভেসে চলবার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। মাদ্রাজের বন্ধুস্থানীয় ও শিষ্যস্থানীয়দের জানালেন নিজ সংকটময় অবস্থা। আর বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পে শুরু করলেন লড়াই, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে—শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদের উপর বিশ্বাস রেখে আর ভগবানের কল্যাণময় নির্দেশের উপর নির্ভর করে।

এইভাবে নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাটল কয়েক দিন। শিকাগো ছেড়ে কম খরচে থাকবার সুবিধার জন্য স্বামীজী গেলেন বোস্টন শহরে।

তারপর দিনে দিনে, ধীরে ধীরে—বাধাবিপত্তির দুর্যোগ তমিস্রা বিদীর্ণ করে ভাগ্যদেবতার হস্তবিধৃত আলোকবর্তিকা উজ্জ্বল হতে শুরু হল। সর্বথা-দেবরক্ষিত স্বামীজীর জীবন পরম সার্থকতার পথে, যুগ-প্রয়োজন সাধনরূপ মহান ব্রত উদযাপনের পথে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত ও সন্ধান পেতে আরম্ভ করল।

গল্প উপন্যাসের মত বিচিত্র সে সব কাহিনী। অথচ তারা সত্য, এবং ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্ সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক জে, এইচ, রাইট্।...

দৈব-নির্দেশে আর স্যানবর্ণ পরিবারের বদান্যতায় বোস্টন শহরে একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ হল স্বামীজীর। সে আলাপ বিবিধ শাস্ত্রের গভীর আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করল ক্রমে।

অধ্যাপক রাইট্ বিস্মিত হলেন স্বামীজীর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা দেখে, স্তম্ভিত হলেন তাঁর অধ্যাত্মিক শক্তির স্বচ্ছতা ও

বিপুলতা উপলব্ধি করে। তাঁর মনে হল আমেরিকার শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকবৃন্দের সম্মিলিত বিদ্যাবত্তার চাইতেও যেন স্বামীজীর পাণ্ডিত্য গভীরতর, ব্যাপকতর।

ফলে, সুপারিশ পত্রের অভাবে স্বামীজী ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি হতে পারছেন না জেনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তৎসংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেন তিনি। সেই সময় কথা-প্রসঙ্গে অকপট শ্রদ্ধায় অধ্যাপক রাইট্ স্বামীজীকে বলেছিলেন—

'To ask you Swami. for your credentials is like asking the sun to state its right to shine.'

ধর্মমহাসভায় প্রবেশপথ এইরূপে ক্রমশঃ সুগম হতে শুরু হল।

কিন্তু কেবল রাইট্ সাহেবই নন। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধি হিসাবে স্থান লাভ করবার পথে, হিন্দুধর্ম ও আর্যসংস্কৃতির বিজয়-বৈজয়ন্তী নূতন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে প্রোথিত করবার পথে— অন্যতম সহায়করূপে আরও একজন মনস্বিনী মহিলার নাম এস্থলে আমরা উল্লেখ করব, উল্লেখ করব শ্রদ্ধার সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

তিনি মিসেস হেইল। শিকাগোর এক বিশিষ্ট ও অভিজাত পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলা, মিসেস হেইল। সেও এক অপূর্ব কাহিনী।...

সেদিন আসন্ন শীতের প্রভাত কালটিতে ঈষৎ কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল শিকাগোর আকাশ। নিজ প্রাসাদোপম বাসগৃহের গবাক্ষমুখে লক্ষ্যহীনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস হেইল। অকস্মাৎ পথচারী

স্বামীজীর শ্রান্ত, ক্লান্ত অথচ অনন্যসাধারণ মূর্তি দেখে দৈবচালিত হয়েই যেন ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়।

জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজীকে,…আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি ?

হাঁ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ঠিকানা হারিয়েছি, পথও চিনি না,—উত্তর করলেন স্বামীজী।

উত্তর শুনেই পরম সমাদর ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে আহার্য দিয়ে, বিশ্রামের সুব্যবস্থা করে, সুস্থ করলেন অপরিচিত ও বিদেশী অ-শ্বেতকায় সন্ন্যাসীকে।

তারপর যথা সময়ে প্রভূত বিত্তশালিনী অভিজাতবংশীয়া সে মহিলা স্বয়ং স্বামীজীকে সঙ্গে করে ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে গেলেন। প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর আহারের ও বাসস্থানের সর্ববিধ ব্যবস্থা করে দিলেন।

যেমন অপ্রত্যাশিত ও অযাচিত, তেমনি অভাবনীয় এসব কাহিনী। বিশ্বাস করতেও দ্বিধা হয় মনে। কিন্তু তথাপি এসব সমসাময়িক ইতিহাসেরই অভ্রান্ত, অবিসংবাদী ঘটনা। দৈবযোগে এমনি ভাবেই সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে বাস্তবক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল বিগত শতাব্দীর শেষ-দশকে।

এই হেইল পরিবারের সঙ্গে উত্তরকালে স্বামীজী এক অতি নিবিড় ও পূত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মিসেস্ হেইলকে স্বামীজী মাতৃসম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। সম্বোধন করতেন মাদার চার্চ বলে। মিঃ হেইলকে বলতেন—ফাদার পোপ। তাঁদের দুই কন্যা ও দুই ভাগ্নীকে সহোদরাধিক স্নেহে ধন্য করেছিলেন স্বামীজী। হেইল

ভগ্নীদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর যে সব অপূর্ব পত্রবিনিময় হয়েছিল, তদীয় পত্রাবলী গ্রন্থে বিচিত্র সম্পদ রূপে সেগুলি অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

বস্তুত, শিকোগোর এই হেইল-গৃহই পরে, স্বামীজীর অন্যতম প্রধান হেড-কোয়ার্টাররূপে পরিণত হয়েছিল।

যে যাই হোক, প্রতিনিধি হিসাবে স্থান লাভ করতে পেরে সব-দিক দিয়েই বড় নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন স্বামীজী। ব্যয়নির্বাহের দিক দিয়েও তিনি যেন নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন।

অধিবেশনের তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। তাই, ধ্যান, প্রার্থনায়, উপাসনায়, পাঠে ও গভীর চিন্তায় মধ্যবর্তী দিনগুলি অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে কাটাতে থাকলেন স্বামীজী।

অবশেষে ধীরে ধীরে সমাগত হল ধর্মমহাসভার সেই স্মরণীয় দিনটি – ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

সভারম্ভের বহুপূর্বেই বিরাট সভাগৃহের মধ্যে ঠেসা-ঠেসি, ঘেসা-ঘেসি হয়ে আসন নিল ইউরোপ-আমেরিকার সাত-আট হাজার বিখ্যাত ও বিশিষ্ট নর নারী। অর্থের গৌরবে অথবা বংশ-কৌলিন্যে শুধু বিখ্যাত নয়, পরন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কিংবা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে যাঁরা খ্যাতিমান তাঁদেরই একত্র সমাবেশে অভূতপূর্ব সে সম্মেলন।

সভাবেদীতে সমাসীন পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের বিশিষ্ট নবীন ও প্রবীণ শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্মবিদ্ প্রতিনিধিগণ। আর সভাপতির সম্মানিত আসনে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণের শীর্ষস্থানীয় কার্ডিনাল গিবন।

নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য, নিজ নিজ মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সর্বথা প্রস্তুত হয়ে এসেছেন সবাই। আর তারই মধ্যে ত্রিশবৎসরের যুবক, ভারত্মার মূর্ত প্রতীক অগ্নিময় পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ।

হিন্দু-ভারতের প্রতিনিধি, সুপ্রাচীন আর্য-সভ্যতার অনিমন্ত্রিত প্রতিভূ বিবেকানন্দ, গৈরিক-বস্ত্র-পরিহিত, গৈরিক-শিরস্ত্রাণ-শোভিত, তপস্যাদীপ্ত মুখমণ্ডল—স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীগুরুর হাতের যন্ত্র, তাঁরই চিহ্নিত প্রতিনিধি বিবেকানন্দ। তাঁরই নির্দেশে, তাঁরই নির্দিষ্ট ইঙ্গিতে সে বিশ্ব-মহাসম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি। ...ভগ্নী নিবেদিতা যেমন বলেছিলেন 'In his case the impelling force that drove him out to foreign lands was the great personality of one at whose feet he sat and whose life he had shared for many years.'

অথচ জীবনে কখনো কোন বৃহৎ সভায় তিনি বক্তৃতা করেন নি, বৃহৎ সম্মেলনকে মুগ্ধ করবার বা প্রভাবিত করবার কোন কৃত্রিম কলা-কৌশল তাঁর অধিগত নয়, বক্তৃতার জন্য পূর্বাহ্নে প্রস্তুত হয়ে আসবার সাধারণ কথাটিও তাঁর মনে ওঠে নি।...

এখন থেকে প্রায় সত্তর বৎসর আগেকার কথা আমরা বলছি।

তখনকার ভারতবর্ষ বা আমেরিকা কোনটাই আজকের ভারতবর্ষ বা আমেরিকার মত ছিল না—কোন দিক দিয়েই।

সপ্ত-সমুদ্রের পরপারের ম্লেচ্ছদেশ আমেরিকা তখনকার ভারতীয় সমাজের কাছে একটি অজানা, দুর্গম বিভীষিকার দেশ বলেইপরিচিত ছিল।...সেখানে গেলে জাতও থাকে না, ধর্মও থাকে না—এই ছিল

ব্যাপক বিশ্বাস। তার ফলে, শ্বেতকায়, ম্লেচ্ছজাতি-অধ্যুষিত সে সুদূর দেশে কচিৎ কেউ তখন যাত্রা করত। আর যে করত, সমাজের বিচারে সে জাতিচ্যুত হত। এই যেমন একদিকে, অপরদিকে, পরাধীন, অর্ধসভ্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কৃষ্ণকায় কতিপয় জাতির আবাস-ভূমি বলেই সে দেশের কাছে ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছিল তৎকালে।...

বর্তমান শতাব্দীর আকাশযানের যদৃচ্ছ ভ্রমণ-সুবিধার যুগে দাঁড়িয়ে রেডিও, টেলিভিসন্ প্রভৃতি শতবিধ যান্ত্রিক প্রচার-ব্যবস্থার 'ওয়ান লয়ার্ল্ড'-এ বাস করে, প্রায় সত্তর বৎসর আগেকার বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর সে-ছবিটি আজ আর আমরা ধরতে পারিনা, সঠিক মনেও আনতে পারিনা। মদগর্বিত শ্বেতজাতিগুলি কৃষ্ণকায় জাতিমাত্রকেই তখন কি অবজ্ঞা-মিশ্রিত কৃপা-দৃষ্টিতে দেখত তাও ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনা, এবং তা পারিনা বলেই, যে দুর্জয় সাহস নিয়ে, যে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় ও সুগভীর ভগবদ্বিশ্বাসে নির্ভর করে অখ্যাত, অজ্ঞাত ও নিঃসহায়, পরাধীন দেশের ত্রিশ-বৎসরের একটি যুবক—সে বিশ্বধর্ম-মহাসভায় তাঁর মাতৃভূমি ও ধর্ম-গৌরব প্রচার করবার জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল সেই প্রতিকূলতার যুগে, তার তাৎপর্য এবং সঙ্কটও সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনা।...

দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য আমাদের ক্ষীণ কল্পনার।

কিন্তু সেকথা এখন থাক।...

সেদিন সোমবার।

ইংরাজী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের, ১১ই তারিখ।

ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশনের ইতিহাস-খ্যাত সেই দিনটি।

সেদিন পূর্বাহ্ণ দশটায় প্রার্থনা ও ঘণ্টাধ্বনির গম্ভীর আরাবের মধ্যে

উদ্বোধন হল সম্মেলনের। একে একে বিভিন্ন ধর্মের সুকৌশলী বক্তাগণ পূর্বপ্রস্তুতি অনুসারে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশে নিজ নিজ ধর্মের ও মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

তারপর অধিবেশনের প্রায় শেষ পর্যায়ে দাঁড়ালেন স্বামীজী।

বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করে, প্রাচীন ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিকুলকে স্মরণ করে, সর্বধর্মের সমন্বয়-প্রকাশ নিজ মহান গুরুকে স্মরণ করে গৈরিকমণ্ডিত অগ্নিময় পুরুষ হিন্দুধর্মের সার্বভৌম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন সে মহতী সভার সম্মুখে।

কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়, কোন একটি দেশের নিজস্ব সম্পত্তিরূপ কোন বিশেষ মতবাদও নয়…পরন্তু ভারতবর্ষের যুগ-যুগ-তপস্যালব্ধ যে শাশ্বত, সমন্বয়ের বাণী—মানুষের চিরন্তন যে সম্পদ, সেই সম্পদই উচ্চারিত হল তাঁর কণ্ঠ থেকে ঃ

একম্ সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি,—
সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—

*   *   *   *

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।…

এই বাণী, ভারতের ভাগ্যবিধাতা, সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণের

জন্য সঙ্কীর্ণতা-পীড়িত, সাম্প্রদায়িকতা-লাঞ্ছিত ধরিত্রীতে নূতন করে প্রচার করলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে।

তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত উদার সে-বেদমন্ত্র মুহূর্তে সভাগৃহে বিচিত্র স্পন্দন জাগ্রত করল। অশ্রুত-শ্রবণ সে বিদ্বজ্জন রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে সে অভিনব সুর-সমন্বিত ঋক্‌গাথা শ্রবণ করল।...

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিল নানাপথজুসাং
নৃণামেক গম্যস্তমসি পয়সার্ণব ইব।

আবার শুনল...

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম,
মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।

কী বিচিত্র ঝঙ্কার, কী বিচিত্র মর্মস্পর্শী আবেদন!

অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত সে মুহূর্তটি।

অখ্যাত, অপরিচিত বিবেকানন্দ—বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেল সেই মুহূর্তটিতে। বহু যুগের লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত ভারতভূমি মর্যাদায় ও সম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পথে প্রথম পাদক্ষেপ করল সেই ক্ষণটিতে।

আর সভামণ্ডপের সেই সপ্ত-সহস্র বিশিষ্ট নরনারী?

মুগ্ধ, বিস্মিত ও সম্মোহিত তাঁরা—অকস্মাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যেন উঠে দাঁড়াল।

অধীর উল্লাসে ও অব্যক্ত আনন্দে যে বিপুল অভিনন্দন তখন তাঁরা স্বামীজীকে জ্ঞাপন করল তাতে নিঃসংশয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশ ও কালের যাবতীয় সংস্কার-সীমা লঙ্ঘন করে ধর্মের শাশ্বত

অমৃতবাণী আবার মানব সভ্যতার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করবে। স্বামীজী বলেছিলেন,...

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি আর তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—ধর্মোন্মত্ততা, বহুযুগ ধরে এই সুন্দরী, নারায়ণী পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে। এদেরই ফলে জগতে কত ভয়াবহ উপদ্রব দেখা দিয়েছে, কতবার অপরিমেয় নরশোণিতে সিক্ত হয়েছে পৃথিবীর মাটি, কতবার কত অমূল্য সম্পদ সমূলে ধ্বংস হয়েছে।

কিন্তু আজ, এই ধর্ম-মহাসম্মেলনের জন্মক্ষণেই তাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হল। আমি প্রার্থনা করি,...আজ এই সম্মেলনের সম্মান-ঘোষণায় যে ঘণ্টা নিনাদিত হল তার ধ্বনি-তরঙ্গ সকল দেশের সকল গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান সূচিত করুক। মানুষে মানুষে প্রীতি ও মৈত্রীর রাখি-বন্ধনে যত বাধা, সেগুলি অপসারিত হোক, বিলুপ্ত হোক।

*   *   *   *

সমাপ্ত হল প্রথম দিনের অধিবেশন! একবাক্যে সমগ্র আমেরিকা স্বামীজীকে সে অধিবেশনের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বলে, নবযুগের আচার্য বলে স্বীকার করে নিল।

প্রথম দিনের পর আরও পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বামীজী সেই ধর্ম-মহাসম্মেলনে। আর শেষ দিনের অধিবেশনের শেষ ভাষণে তিনি বলেছিলেন—

এই মহাসম্মেলন যদি জগতে কোন সত্য সার্থকভাবে প্রমাণ করে থাকে তবে সে সত্যটি এই যে—পবিত্রতা, শুচিতা ও দাক্ষিণ্য

কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ ধর্মের একক সম্পত্তি নয়, মনোপলি নয়। যুগে যুগে অতি মহৎ, অনুপম ও দেব-চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে প্রত্যেক ধর্মে, প্রত্যেক দেশে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে।...

এ-সকল সত্ত্বেও যদি কেউ এ-কথা চিন্তা করে থাকেন যে এই বিশাল বিশ্বে নিরবধি কালের বুকে শুধু তাঁরই ধর্মমতটি, তাঁরই জীবন-দর্শনটি জীবিত থাকবে, আর সব ধ্বংস হয়ে যাবে, বিনষ্ট হয়ে যাবে—তবে তিনি কৃপার পাত্র। তাঁর জন্য আমি আন্তরিক দুঃখ-বোধ করি, আর সেই সঙ্গে তাঁকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিই যে অদূর ভবিষ্যতে প্রতি ধর্মের পতাকাগাত্রে একথাটিই লিপিবদ্ধ হবে—

'বিবাদ নয়, সহায়তা; ধ্বংস নয়, গ্রহণ; দ্বন্দ্ব নয়, মৈত্রী, শান্তি ও সমতা।

Help and not Fight, Assimilation and not Destruction, Peace and Harmony and not Dissension.

সর্বদেশের সর্বকালের নরনারীর জন্য রক্ষিত আছে সে-সকল ভাষণ 'শিকাগো বক্তৃতা' নামক তাঁর অমর গ্রন্থটিতে। রুচি বিকারগ্রস্ত বর্তমান-সমাজ সে গ্রন্থের পাঠ ও অনুশীলনে উপকৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

* * * *

সম্পূর্ণ এক নূতন ধরনের জীবনের সূত্রপাত হল এখন থেকে স্বামীজীর। অবাধ ও মুক্ত জীবন, রমতাসাধু বিবেকানন্দ এখন থেকে সমগ্র বিশ্বের বিমুগ্ধ ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টির পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

এখন থেকে পথে পথে, মোড়ে মোড়ে, হাজার হাজার নর-নারীর

বিষম ভিড় জমতে লাগল তাঁর তিলেকের দর্শন লাভের জন্য। সাংবাদিকদের মধ্যে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তাঁর বাণী ও বক্তৃতা প্রকাশ করবার জন্য। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশিষ্ট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁকে অবিশ্রাম আমন্ত্রণ পাঠাতে লাগল বক্তৃতার জন্য, ভাষণের জন্য।

দলে দলে উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট নরনারী কখনো ব্যক্তিগত জটিল সমস্যা নিয়ে, কখনো তাঁর মতবাদ খণ্ডিত করবার মানসে, কখনো বা কোন বৃহত্তর প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে লাগল।

কর্মের আবর্তের মধ্যে অক্লান্ত ও অবিশ্রাম ঘুরতে লাগলেন স্বামীজী।

শিকাগো, নিউইয়র্ক, ডেট্রিয়ট, বোস্টন, ওয়াশিংটন, বাল্‌টিমোর, ব্রুকলীন, আইওয়া—এক শহর থেকে আর এক শহরে, এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে, বেদান্তের বাণী বহন করে, ভারতীয় সভ্যতার অমৃতমন্ত্র ও শান্তির বার্তা বহন করে ঝঞ্ঝার গতিতে তিনি ভ্রমণ করতে লাগলেন। আমেরিকা বলল—সাইক্লোনিক্ হিন্দু···বলল, দেবমানব, গড্-ম্যান বা পাওয়ার।

সর্বত্র বিপুল জনসমাগম, সর্বত্র শিক্ষিত ও বিদ্বৎসমাজের বিশিষ্ট নরনারী তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগল, সাগ্রহে শুনতে লাগল তাঁর বাণী, তাঁর মেসেজ্।

কিন্তু এটি এক দিকের ছবি মাত্র।

অন্যদিকে, সঙ্কীর্ণ, রক্ষণশীল গোঁড়া-ধর্মধ্বজীর দল, ঈর্ষাকাতর পুরোহিত-সম্প্রদায়—স্বার্থহানির আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনাও শুরু করল ব্যাপকভাবে। তাঁকে বিপন্ন করবার জন্য,

লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য ঘৃণিত ষড়যন্ত্রও করতে লাগল তারা—শুধু ওদেশেই নয়, কতিপয় নীচমনা ভারতবাসীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষেও।

ডেট্রিয়ট শহরে এবং বোস্টনেই সে অপচেষ্টার ব্যাপকতম অভিব্যক্তি ঘটেছিল। বিভিন্ন ছোট-বড় সাময়িক পত্রিকাগুলিতে, বড় বড় গীর্জায়, সভাসমিতিতে—স্বামীজীর বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে বিকৃত কুৎসা ও অপপ্রচার চলেছিল অতি ব্যাপকভাবে এবং প্রায় বৎসরাধিকাল ধরে। আজ সে সকল কঠিন ও সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের তীব্রতা এবং বিপুলতা বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানতে পেরে আমরা বিস্মিত হচ্ছি, অভিভূত হচ্ছি। কিন্তু সর্বথা-দেবরক্ষিত-জীবন বিবেকানন্দ, প্রভাত সূর্যের মত স্নিগ্ধ ও জ্যোতিষ্মান স্বামীজী…তাতে বিচলিত হন নি। কখনো ভ্রুক্ষেপ-হীন উপেক্ষায়, কখনো কঠিন প্রতিঘাতে স্তব্ধ করেছিলেন আততায়ীদের।

বলেছিলেন,

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার,
সাধুলোক্‌কো দুর্ভাব নেহি যব নিন্দে সংসার।

বলেছিলেন,—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মী সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব বা মরণমস্তু শতান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

বস্তুত ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত স্বামীজী, সিংহবীর্য অগ্নিময় সে পুরুষ -দৃপ্ত কেশরীরই মত চলতে থাকলেন—সত্যের আলো বিকীর্ণ করে,

প্রেমের প্রবাহ সৃজন করে, আর মানবধর্মের যুগবার্তা প্রচার করে।

তাই, স্বার্থান্বেষীদের শত অপচেষ্টাসত্ত্বেও নামযশের তাঁর অবধি রইল না। বিখ্যাত ধনকুবেররা, প্রথিতকীর্তি পণ্ডিতরা তাঁর আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভের জন্য, তাঁকে অতিথিরূপে পেয়ে ধন্য হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতে লাগল।

আর স্বামীজি?—

সর্বত্যাগী, আজন্মবৈরাগী স্বামীজী—সে সুদুর্লভ, স্বতঃউচ্ছ্বসিত সম্মান ও বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে, অর্থ ও প্রাচুর্যের সে অবিশ্বাস্য আতিশয্যের মধ্যে কেবলই হাঁপিয়ে উঠতেন, জন্মভূমির অশেষবিধ দুঃখের কথা স্মরণ করে তীব্র বেদনায় কেবলই পীড়িত হতেন।

ধনীর প্রাসাদে দুগ্ধধবল শয্যায় শুয়ে রাত্রে তাঁর ঘুম আসত না। কত বিনিদ্র রজনীর প্রহরগুলি গৃহের মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে অব্যক্ত বেদনার মধ্যে তাঁর অতিবাহিত হত।

দূর মাতৃভূমির দিকে মুখ করে করুণ প্রার্থনায় ভগবানকে ডাকতেন তিনি।

বলতেন,...কত আলো, কত ঐশ্বর্য এদেশে অকৃপণ হস্তে তুমি দান করেছ ভগবান। ভারতেই কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার!

দূর কর, দূর কর সে তমসা, জ্যোতির্ময় হে দেবতা!

ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশ থেকে স্খালন কর অভিশাপ-কালিমা, অপসারিত কর অজ্ঞানের মসীকৃষ্ণ আবরণ—

জাগ্রত হোক, উদ্বুদ্ধ হোক, পরিশুদ্ধ হোক আমার জন্মভূমি।

আমার স্বপ্নের সোনার ভারতবর্ষ!

'দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতঃ, লোকাঃ সন্তু নিরাময়া।'

তাই দেখতে পাই সুদূর আমেরিকায় বসে, কর্মসমুদ্রের অবিশ্রাম তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে আবদ্ধ থেকেই তাঁর মূল উদ্দেশ্য সাধনে এখন থেকে তিনি তৎপর হয়েছেন, কাজ শুরু করেছেন ভারতবর্ষের জন্য। প্রথমে, দীর্ঘ পত্রাদির মধ্য দিয়ে অগ্নিময় বাণী ও বিস্তৃত কর্মনির্দেশ পাঠাতে লাগলেন বাংলায় গুরুভাইদের কাছে, আর মাদ্রাজে বন্ধুবর্গের কাছে এবং শিষ্যস্থানীয়দের কাছে।

আবার নানা দিক থেকে সংবাদপত্রাদির মধ্য দিয়েও তাঁর আমেরিকা অভিযানের এবং তথাকার কর্মসাফল্যের চমকপ্রদ সব কাহিনী ধীরে ধীরে ভারতে এসে পৌঁছাতে লাগল।

ফলে, সত্যই সুপ্তোত্থিত হল ভারতবর্ষ। সচকিত হয়ে, বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে শুনলো ভারত-ভারতী…

কোন দূর অব্ধিপারের ধনকুবেরের দেশে, শত প্রতিকূলতার মধ্যে ভারতেরই এক অজ্ঞাত, অখ্যাত তরুণ সন্তান অকুতোভয়ে ঘোষণা করছে আর্যসভ্যতার পরম বাণী, অমর আত্মার শাশ্বত বাণী… Message of the Soul…

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

'শোন বিশ্বজন
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে

মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়,
তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি,
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার
অন্যপথ নাহি।'…

Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings…Ye divinities on earth—sinners ! It is a sin to call a man so…

আবার, সেই সঙ্গে একই কালে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যেও উচ্চারণ করছেন উৎসাহ-উদ্দীপনার সজীব বীজমন্ত্র, প্রাণদমন্ত্র—

আগুণের বুকে লাফিয়ে পড়,
ঝাপ দিয়ে পড় কর্মে,—
প্রভুর চরণে সঁপি দাও প্রাণ,
মতি রাখ নিতি ধর্মে।…

একটা জীবন না হয় প্রভুর নামে, প্রভুর কার্যেই কেটে যাবে—নির্ভীক অন্তরে অগ্রসর হও, ব্রতী হও ! ভয়কি, ভয় কিসের !

প্রার্থনা কর, দিনরাত প্রার্থনা কর—নিজের জন্য নয়, পদদলিত, উপেক্ষিত ভারতের কোটি কোটি নরনারীর জন্য—যারা যুগের পর যুগ কেবলই লাঞ্ছিত হয়েছে, নিষ্পেষিত হয়েছে, তাদেরই জন্য।

অন্য কোন দেবতা নয়, অন্য কোন ভগবান নয়—নিরন্ন জনই

দেবতা, আর্তজনই জাগ্রত ভগবান—তাদেরই সেবায়, তাদেরই দুঃখ-মোচনে জীবনের সকল শক্তি নিয়োগ কর, সকল কাম্যফল উৎসর্গ কর,...তবেই প্রসন্ন হবেন দেবতা, কৃতার্থা হবেন জননী, পূর্ণ হবে জাবনাভিলাষ।

অতীত হল প্রায় দুই বৎসর কাল—১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়, অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মঋতুতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। সেটি এখানে বলা প্রয়োজন।

উত্তর আমেরিকার সেণ্ট্-লরেন্স নদীর বুকে সহস্রদ্বীপোদ্যান, Thousand Island Park, একটি ছোট দ্বীপ।

সেই ছোট দ্বীপের একটি দ্বিতল বাটীতে প্রায় দেড়মাস কাল একান্ত অনুগত কতিপয় নরনারী সহ এইকালে বাস করেছিলেন স্বামীজী।...অকপট শ্রদ্ধা ও আগ্রহ যাদের, যাদের ধ্যানসংস্কার প্রবল তাঁদের হাতে হাতে, কার্যকরীভাবে যোগশিক্ষা দিবার জন্য, ধ্যানশিক্ষা দিবার জন্য সেই নির্জন স্থানে, নিসর্গের সেই একান্ত নিস্তব্ধ নীরবতায় কয়েকটি সপ্তাহ অতিবাহিত করেছিলেন তিনি। সব দিক দিয়েই সেখানকার সেই স্বল্প-কালের নিভৃত ধ্যান-জপের এবং অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক-অনুভূতির শান্তিময় ও আনন্দময় দিনগুলি স্বামীজীর আমেরিকার জীবনে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় যোজনা করেছিল।

'দেববাণী' বা Inspired Talks নামক বিখ্যাত গ্রন্থটিতে সেই অনুপম কাহিনী লিপিবদ্ধ করে অমর হয়েছেন তাঁর অন্যতম মার্কিন শিষ্যা মিস্ ওয়াল্ডু।

এইভাবে, দিনে দিনে আমেরিকার মানসক্ষেত্রের অতি গভীরে স্বামীজীর মহতী প্রচেষ্টার অক্ষয় বীজ মহামহীরুহরূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল।

বেদান্তের সার্বভৌম উদার বাণী, আত্মার অমরত্বের শাশ্বত বার্তা দিনে দিনে সে-দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত অনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করে যথাবিহিত ধ্যানাভ্যাসে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবার জন্য।

আজ স্বামীজীর আমেরিকার অনতিদীর্ঘ কর্মজীবনের আলোচনা-সূত্রে বহু নূতন তথ্য ও সংবাদ নানা দিক থেকে নানাভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছে।

মেরী বাকের—'নিউ ডিস্‌কভারিস্ অন্ স্বামী বিবেকানন্দ' নামক বৃহদায়তন গ্রন্থে তাদের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বহু প্রাচীন দলিল, চিঠিপত্র ও তৎকালীন সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি থেকে স্বামীজীর আমেরিকার কর্মজীবনের মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর-বিভাগ তিনি আবিষ্কার করেছেন।

প্রথম পর্যায়ে স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধির বিনিময়ে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক কৌশল ও সংগঠনী শক্তি ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য তিনি আনয়ন করবেন। তাদেরই অর্থ ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সহায়তায় শিল্প-শিক্ষার ও কারিগরিশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন এদেশে।

কিন্তু, চিকাগো ধর্মসভার অপ্রত্যাশিত সাফল্যে আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজে অতি অল্পকাল মধ্যে স্বামীজী যে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন, দিকে দিকে তাঁর যে যশ ও সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল—গোঁড়া খ্রীষ্টান সমাজের পক্ষে নানাকারণে সেটি কঠিন বিদ্বেষ এবং অসূয়ার হেতু হয়ে উঠেছিল। ফলে, অমিতশক্তিশালী ও দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্মযাজিগণ এইকালে একযোগে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নানাপথে স্বামীজীর বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হয়েছিল।

স্বামীজীর কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, এই বিপুল বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে দুর্জয় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। তখন ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, রীতিনীতি প্রভৃতি সব কিছুর অকুণ্ঠ সমর্থনেই যেন তিনি তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর সে-কালের অনমনীয় যোদ্ধৃমূর্তি বেদান্তের অভীমন্ত্রেরই জীবন্ত নিদর্শনরূপে যেন মূর্ত হয়েছিল, প্রতীত হয়েছিল।

কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে, অকস্মাৎ এ-সকল বাহ্য ব্যাপারের অবসান হয়েছিল। অকস্মাৎ পরিস্ফুট হয়েছিল এক অভিনব ও গভীর উপলব্ধি। তিনি অনুভব করেছিলেন, প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করেছিলেন যে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে শিল্প বা কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থ বা লোক সংগ্রহ নয়, তার বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারের প্রতিরোধ করাও নয়। পরন্তু, সে উদ্দেশ্য এক মহত্তর, বৃহত্তর এবং বিরাটতর লক্ষ্যে সুনির্দ্দিষ্ট।

সেইজন্য সন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রান্তভাগে—যুগ-প্রবর্ত্তকের অনতিক্রম্য অধিকার নিয়ে সহসা উচ্চারণ করেছিলেন তিনি এই বাণী—

I have a message to the West as Buddha had a message to the East.

মেরী বার্কের নিজস্ব ভাষায়—

'Whatever might be the date on which Swamiji wrote the above—it is certain that by the end of December, 1894, he was finding in Vedanta 'the one grand philosophy' and that he was fully consci-

ous of the nature and dimensions of his message, for it was on the last day of the year that he decelared with the startling directness of a true Prophet : 'I have a message to the West as Buddha had a message to the East'—a statement which can leave no doubt in any one's mind that he had arrived at a clear knowledge of his mission'.

যাই হোক, এইভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগ ও তপস্যালব্ধ তত্ত্ব, যার পরে বা উপরে আর কিছু নেই,—

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক—
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

সেই তত্ত্বই যেন প্রতিষ্ঠা পেল নূতন গোলার্ধের বুকে—ঐশ্বর্যের অমরাবতী, নবজাগ্রত জনপদ আমেরিকায়।

এরপর কিঞ্চিদধিক একমাসের একটি ক্ষুদ্র বিরতি, অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় শেষ দিকের একমাস কালের একটি ব্যবধান। আমেরিকা থেকে স্বামীজীর প্রথম ইংলণ্ড যাত্রা। কতিপয় বন্ধু ও গুণগ্রাহী পরিচিত ব্যক্তি সাগ্রহ-আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেখান থেকে।

কিন্তু স্থিতি-স্থাপকধর্মী, রক্ষণশীল ইংলণ্ড, পৃথিবীজোড়া রাজত্বের অধীশ্বর, মদগর্বিত ইংলণ্ড…তৎকালীন ভারতের সর্বময় অধিপতি ইংলণ্ড, কী ভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে, কী মর্যাদা দেবে—সে সম্পর্কে

যথেষ্ট সংশয় ও দ্বিধা জাগ্রত হয়েছিল তাঁর মনে। তথাপি সকল পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনা করে ইংলণ্ডে যাওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। আর তদনুসারে যাত্রা করেছিলেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, সেপ্টেম্বরে।

কিন্তু যুগে যুগে, কালে কালে যে সত্য বহুধা পরীক্ষিত হয়েছে, ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণিত হয়েছে—সত্যাশ্রয়ী স্বামীজীর জীবনেও সেই সত্যই পুনঃ প্রমাণিত হল, প্রতিষ্ঠিত হল ··

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

বস্তুত, কোন মহামন্ত্রে যেন রক্ষণশীলতার দুর্গদ্বার মুহূর্তে তাঁর সম্মুখে খুলে গেল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলি অতি সত্বর তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে আরম্ভ কবল, সুচিন্তিত সমালোচনা এবং প্রশংসায়ও মুখর হল। বহু বিশিষ্ট নরনারী প্রাচ্যের বাণী শুনবার জন্য, বেদান্তের মতবাদ জানবার জন্য তাঁর চারদিকে এসে সমবেত হতে লাগল।···

অতি অল্প সময় একমাস। কিন্তু তারই মধ্যে তত্রত্য প্রভাবশালী সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করলেন তিনি। তারপর, একমাস অন্তে পুনর্বার শীঘ্র ইংলণ্ডে ফিরবেন স্থির করে প্রত্যাবর্তন করলেন আমেরিকায়।

।সেত,

আমেরিকায় তখন সংগঠনের কাজ শুরু হয়েছে। যে তত্ত্ব এতদিন বক্তৃতায়, ভাষণে ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়েছে, তাই এখন স্থায়ী সংস্থার মধ্য দিয়ে, কার্যকরী শিক্ষার ভিতর

দিয়ে জীবনে প্রতিফলিত করবার দুশ্চরব্রতে ব্রতী হয়েছেন আমেরিকার বহু বিশিষ্ট নরনারী।

রাজযোগ, ভক্তিযোগ, মদীয় আচার্যদেব প্রভৃতি স্বামীজীর বিখ্যাত গ্রন্থাদিও তখন ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। আর প্রকাশিত হয়েছে 'দেববাণী' নামক তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি, যার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং এখন প্রধানতঃ সংগঠন ও ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার কাজেই স্বামীজীকে বেশী মনোযোগ দিতে হল আমেরিকায়। বক্তৃতাদির মধ্য দিয়ে প্রচারকার্যও যে না চলতে থাকল •মন নয়, তবু খাঁটি বৈদান্তিক গড়ে তুলবার কাজেই প্রধানতঃ তিনি আত্মনিয়োগ করলেন এইকালে।

নিজ কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করে এই সময় তাই তিনি বলেছিলেন—

'We have no organisation nor want to build any. Individuality is my motto. I have no ambition beyond training individuals···I am a Sannyasin. As such I hold myself a servant, not as a master in this world.···

কিন্তু এখানেও এবার অতি অল্প সময়, মাত্র চারমাস মতো কাল, তাঁর থাকা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আবার জরুরী আহ্বান এসেছিল ˘ ˜ণ্ড থেকে এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি যাত্রা করছিলেন সে দেশে।

ইংলণ্ডে দ্বিতীয়বার, প্রথমবারের চাইতে অনেক বড়, অনেক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল। ম্যাক্সমুলার প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভাব ও প্রীতির আদান-প্রদান সাধিত হল।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বিশিষ্ট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রিত হয়ে বেদান্ত প্রচারের অতি অনুকূল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হলেন তিনি এইবার।

আবার শুধু ইংলণ্ডেই নয় ইউরোপের অন্যান্য কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্থানও এ-যাত্রায় স্বামীজী পরিভ্রমণ করলেন।

সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানি, নেপল্‌স প্রভৃতি বিভিন্নস্থানে পদার্পণ করে তত্রত্য সুধীসমাজের শীর্ষস্থানীয় মনস্বিগণের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করলেন। পল্ ডয়সন্, ফ্রেডারিক মায়ার্স, রেভারেণ্ড জন্‌পেজ্ প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হল, পরিচয় ঘটল।

এইরূপে নবযুগের ভারতীয় ঋষি প্রায় তিনবৎসরকাল ধরে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রস্থলে—আমেরিকায়, ইংলণ্ডে ও মধ্য-ইউরোপে ভারতীয় সভ্যতার অমর বাণী ও বৈদান্তিক ধর্মের উদার সার্বভৌম তত্ত্ব নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও অনুভূতির জীবন্ত-ভাষ্যে প্রচার করে, ভারতবর্ষের লুপ্তগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন বহির্ভারতে। বৈজ্ঞানিক সভ্যতাগর্বিত, বস্তুতান্ত্রিক শ্বেতজাতিপুঞ্জের সম্মুখে উদঘাটিত করলেন যথার্থ শান্তি, প্রীতি ও সাম্যের পথ। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন কর্মকুণ্ঠ ভারতবর্ষকে, দেশাত্মবোধে জাগ্রত করলেন পরশাসিত জাতিকে আর খাঁটি ভারতীয় আদর্শে, এবং পরিচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, স্থাপত্য, প্রভৃতি গড়ে তুলবার জন্য সচেতন করলেন বিদগ্ধ-সমাজকে।

বহুকালের গাঢ় নিদ্রা থেকে জাতি যেন জাগ্রত হতে শুরু করল।

এমনি করে, একদা তিন বৎসর পূর্বে যে দুঃখিনী, হৃতসর্বস্ব ও নগ্নিকা মাতৃভূমির অশ্রুমোচন করবার জন্য নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গ বিবেকানন্দ—একান্ত অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়িয়েছিলেন বোম্বাই বন্দর থেকে, আজ দেবতার আশীর্বাদে আর স্বকীয় অনন্য-সাধারণ দিব্য প্রতিভায় ও আত্মপ্রত্যয়ে সেই দুরূহ ব্রত বহুলাংশে উদ্‌যাপিত করে —কর্মক্লান্ত দেহে দেশে ফিরবার প্রয়োজন বোধ করলেন তিনি।

এই সময়, দেশমাতৃকাও অন্তরে অন্তরে আহ্বান করল যেন তার বীর সন্তানকে, তার নবযুগস্রষ্টা আচার্যকে। আর সেই আহ্বান প্রাণের একান্ত গভীরে সুস্পষ্ট অনুভব করে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি ভারতবর্ষে ফিরবার সিদ্ধান্ত করলেন।

রুশ দেশে যাবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে এই সময় জনৈক বন্ধুকে লিখেছিলেন—অন্তরের নিভৃত নিরালায় আমার পুণ্য-জন্মভূমির আহ্বান-ধ্বনি আমি শুনতে পেয়েছি। আমার গুরু যেন বলছেন—এখন আর নয়। ভারতবর্ষে ফিরে যাও। Go back to India। সুতরাং রুশদেশে যাবার প্রস্তাব এবারের মত মুলতুবী রইল।—

তাই দেখি, সহসা একদিন—তখন তিনি নেপল্‌সে—তাঁর অন্যতম ইংরেজ শিষ্যা মিসেস্ সোভিয়ারকে ডেকে যত শীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষ-যাত্রার ব্যবস্থা করতে আদেশ করলেন।

বললেন…'চারখানা টিকিট কাটবে, চারটি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করবে।' বলা বাহুল্য, একটি তাঁর নিজের জন্য আর তিনটি তিন জন ইংরেজ শিষ্য-শিষ্যার জন্য।

তার মধ্যে একজন তাঁর অতি বিশ্বস্ত সাঙ্কেতিক লেখক জে, জে, গুড্‌উইন, আর দুইজন মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার—যাঁরা পরবর্তী কালে হিমালয়ের নিভৃত নির্জনতায় মায়াবতীতে প্রস্তুত করেছিলেন আশ্রম—'অদ্বৈত আশ্রম'।...

অবশ্য ব্যবস্থা হতে বিশেষ বিলম্ব হল না।

ইতিমধ্যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কাজের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করে নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত মনে—সাক্ষীর ভাবে—ভারতবর্ষ অভিমুখে পা বাড়ালেন মানব কল্যাণব্রত-সন্ন্যাসী নেপলস্ বন্দর থেকে।

৩০শে ডিসেম্বর ছাড়ল তাঁর জাহাজ—প্রিন্ট্‌জ রিজেন্ট লুইট্‌পল্ড জাহাজ।

* * * *

ভারতবর্ষ!

তাঁর শৈশবের ক্রীড়ানিকেতন, স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্য জন্মভূমি ভারতবর্ষ। তাঁর যৌবনের স্বপ্ন-উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, তীর্থক্ষেত্র ভারতবর্ষ!

সেই ভারতবর্ষে ফিরে চলেছেন তিনি কতকাল পরে!

অন্তরে সহস্রবিধ কর্ম-পরিকল্পনার সুস্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্ল্যান নিয়ে, অব্যক্ত শ্রদ্ধা ও প্রেমের পরিপূর্ণ অর্ঘ্যথালি সাজিয়ে উৎফুল্ল স্বামীজী জাহাজে ভেসে চলেছেন। বহুশ্রমের পর পূর্ণ বিশ্রাম ও প্রশান্ত আনন্দের সে দিনগুলি!

উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিচে অন্তহীন প্রশান্ত নীলসমুদ্র। আর তাদেরই মধ্যে ভারতযাত্রী ধ্যান-নিমগ্নমানস, হৃদিবান স্বামী বিবেকানন্দ।

পথে পথে উচ্ছ্বসিত আনন্দে কখনো সঙ্গীদের কাছে ব্যক্ত করছেন বিরাট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, মধ্যে মধ্যে চকিতে প্রকাশিত হচ্ছে অন্তরের সুগভীর দেশপ্রীতি—

'India I loved before I came away. Now the dust of India has become holy to me, the very air is now to me holy···it is now the holy land, the place of pilgrimage,···the Tirtha'.

এ-সময়কার সমুদ্র-জীবনের ছোট দু'টি ঘটনা এখানে বলি। একটি ঘটনা স্বপ্নের, অন্যটি বাস্তবের।

স্বপ্নটি দেখছিলেন, একদিন মধ্যরাত্রিতে ক্রীট দ্বীপের নিকট দিয়ে জাহাজ যাবার সময়। সবেমাত্র ঘুমিয়েছেন তখন স্বামীজী। তারি মধ্যে দেখলেন এক শ্বেত-শ্মশ্রু দীর্ঘকায় পুরুষ ঠিক তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন···

ঐ দেখ, ঐ ক্রীট দ্বীপ। একদা ঐস্থান থেকে উত্থিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম অর্ধ পৃথিবী প্লাবিত করেছিল। ইতিহাসের এ এক মহা-সমাধি। খোঁড়, খুঁড়লেই তার সন্ধান পাবে।

স্বপ্ন দেখেই ঘুম ভেঙ্গে গেল স্বামীজীর। কেবিন থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন তিনি। জাহাজের একজন কর্মচারীকে সম্মুখে দেখে প্রশ্ন করলেন,—কত রাত্রি এখন ?

—বারোটার কিছু বেশী।

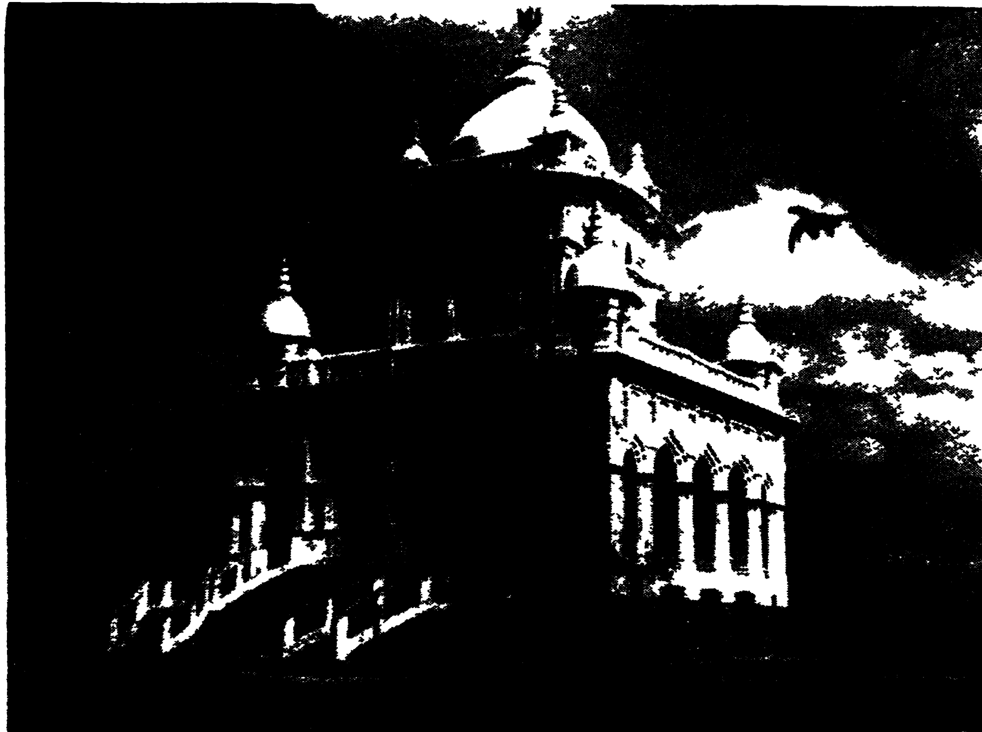
—আমরা এখন কোথা দিয়ে চলেছি ?

—ক্রীট দ্বীপের পঞ্চাশ মাইল দূর দিয়ে।···'Fifty miles off Crete..'

স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অকল্পিত সঙ্গতিতে বিস্মিত হলেন স্বামীজী। স্বপ্নটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি জীবিত থাকতে



(III) যুগাচার্য বিবেকানন্দ।



(IV) স্বামীজীর সমাধি মন্দির।

অবশ্য বিশেষ কিছুই হয়নি, কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের পর সত্যই ক্রীট দ্বীপের ভূগর্ভ খনিত হয়েছিল এবং খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত বহুবিধ মূল্যবান উপাদান সেখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল।—

আর দ্বিতীয় ঘটনাটি বাস্তবের।

দু'জন খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক ইংরেজ, জাহাজে সহযাত্রী ছিলেন স্বামীজীর। জাহাজ নেপল্‌স ছাড়বার দু'চারদিন পরই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের আলাপ পরিচয় ঘটেছিল। আলাপের সূত্র ধরে একদিন হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা শুরু করলেন সেই পাদ্রীদ্বয় স্বামীজীর সঙ্গে। কিন্তু তর্কযুক্তির সম্বল তাঁদের অতি অল্প সময়েই ফুরিয়ে গেল। তখন শুরু হল, যা সচরাচর হয়ে থাকে, হিন্দুধর্মকে অভদ্র গালাগালি, হিন্দুজাতিকে অশ্লীল আক্রমণ।

জাহাজের ডেকের উপর পাশাপাশি হাঁটছেন তখন তিনজন, দু'পাশে দু'জন আর স্বামীজী মধ্যে।

কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে, দু'একবার প্রতিবাদ করে স্বামীজী শুনলেন সে-সব গর্বিত অপভাষণ যার মধ্যে যুক্তি নেই, ঐতিহাসিক সত্য নেই। আছে শুধু ঘৃণা, ব্যঙ্গ আর তাচ্ছিল্য।—তারপর অকস্মাৎ বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন প্রধান নিন্দুকের কণ্ঠনালী।

সিংহগর্জনে বিশাল নেত্রদ্বয় প্রদীপ্ত করে বললেন, 'আর একটিবার তুমি আমার ধর্মকে অন্যায় গালাগালি দিয়েছ কি আমি তোমাকে দূর সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছি। সাবধান!'

'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি' !...সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল উদ্ধত ইংরেজ। ক্ষমা চাইল তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে, বন্ধুত্ব ভিক্ষা করে নিল অতি বিনীতভাবে।

এই ঘটনাটির যৌক্তিকতা নিয়ে পরবর্তীকালে কোন এক বাঙালী ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীজীকে একদিন। স্বামীজী তখন কলিকাতায়।

স্বামীজী উত্তরে শুধু বলেছিলেন,—আপনার জননীকে যদি কেউ আপনারই সম্মুখে গালিগালাজ করে তবে আপনি কি করেন?

—কেন, তাকে উচিত মত শিক্ষা দিয়ে দি।

তা হলে,—ধীরে ধীরে বলেছিলেন স্বামীজী—যে-ব্যক্তি সমগ্র-দেশের মাতৃরূপা ধর্মকে যথার্থ জননীবোধে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, সে তার অন্যায় এবং অযথা নিন্দা শুনলে,—বিশেষত একজন উদ্ধত বিদেশীর কাছে—অন্যরূপ ব্যবহার কেমন করে করবে? কেন করবে?

আর কোন প্রত্যুত্তর করেননি ভদ্রমহোদয়।

বস্তুত, প্রেম ও তেজস্বিতা, কারুণ্য ও তীক্ষ্ণ স্বাজাত্যাভিমান, জ্ঞান ও কর্মশক্তি, ধ্যান ও সংগঠনতৎপরতা, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম—সর্ব বিপরীত গুণাবলীর অদৃষ্টপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল এ ক্ষণজন্মা মনীষীর দেবদুর্লভ জীবনে।

'এমনটি হয় নি, হবে না', 'যে গুণ ও শক্তিতে কেশব জগদ্বিখ্যাত হয়েছে, তেমন আঠারটি গুণের পূর্ণ বিকাশ নরেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে।' —তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই যে সব উক্তি, তা সর্বাংশে

সার্থকতা লাভ করেছিল তদীয় উত্তর জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিতে।

* * * *

৩০শে ডিসেম্বর জাহাজ নেপলস্‌ ছেড়েছিল, একথা পূর্বে বলেছি। ষোল-সতের দিনে সে ভারতবর্ষের প্রান্তে এসে পৌঁছাল।

সেদিন ১৫ই জানুয়ারী, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

রাত্রির অন্ধকার অপগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উষালোকে কলম্বো বন্দর দেখা গেল।

স্বামীজী জাহাজের 'ডেকে' দাঁড়িয়ে—তমালতালিবনরাজিনীলা কলম্বোর বেলাভূমির দিকে তাকিয়ে ভক্তিবিনম্র অকুণ্ঠিত প্রণতি জ্ঞাপন করলেন দেশমাতৃকাকে।

মনে মনে বললেন, আর্যসভ্যতার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্মভূমি, বেদ-প্রসবিনী হে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশমাতৃকা,—দীন সন্তানের ঐকান্তিক প্রণাম গ্রহণ কর।

তোমারই লুপ্তগৌরবে ও লাঞ্ছিত মর্যাদায় ব্যথিত হয়ে, তোমার একান্ত সহায়হীন, অকিঞ্চন সন্তান আমি—একদা ভোগৈশ্বর্যের কেন্দ্রভূমি আমেরিকায় যাত্রা করেছিলাম। তোমার মুক্তিপথের সন্ধান লাভের জন্য সমগ্র পৃথিবী উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করেছি—আলস্য করিনি, বিশ্রাম করিনি।

সাফল্য কিছু অর্জন করেছি কিনা ভাবীকাল তা নিরূপণ করবে। কিন্তু শুধু ঐকান্তিক প্রয়াসের জন্য, শুধু কুণ্ঠাহীন ও

সাধ্যাতিরিক্ত শ্রমের জন্য—পরিপূর্ণ অন্তরে, শান্তচিত্তে তোমার ক্রোড়ে ফিরে আসতে আজ আর আমার কোন দ্বিধা নেই।

হে পুণ্য পীঠস্থান, হে পুণ্য জন্মভূমি, আমার প্রণতি গ্রহণ কর।

'ও আমার দেশের মাটি
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

সমুদ্র-শীকর-স্পৃষ্ট ভারতের শুদ্ধ, স্নিগ্ধ বায়ু বহুকাল পর আবার তাঁর সর্বাঙ্গে আশিস-স্পর্শ দান করল।

———

তিন

শিশিরসিক্ত প্রভাতের প্রথম প্রহর।

উদয়-শিখরে নূতনসূর্যের প্রথম আবির্ভাবে নবযুগের উদ্বোধন হল ভারতবর্ষে।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

পশ্চিম সিংহলের কলম্বো বন্দরে পদার্পণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

কলম্বোর বেলাভূমিতে সূর্যকরোজ্জ্বল নির্মেঘ আকাশতলে সেদিন কী মহতী জনতা! ধর্মনির্বিশেষে, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে, উচ্চাবচ-নির্বিশেষে—সহস্র সহস্র নরনারীর কী বিপুল ও উৎসুক সমাবেশ!

ধীরে ধীরে প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অগ্রসর হ'লেন জেঠির দিকে। ধীরে ধীরে প্রচণ্ড আনন্দ কোলাহলের মধ্যে পুষ্পে মাল্যে, ধূপে দীপে বন্দনা জ্ঞাপন করলেন তাঁরা স্বামীজীকে।

পুরনারীগণ উলুধ্বনি দিয়ে, শঙ্খধ্বনি দিয়ে,—লাজ ও পুষ্প বর্ষণ করে অভিনন্দিত করল সে মন্ত্রার্থদ্রষ্টা ঋষিকে, সে নবযুগপ্রবর্তক আচার্যকে।

স্বামীজী প্রীত হলেন, আনন্দিত হলেন।

নিজের গৌরব-মহিমার জন্য নয়, ব্যক্তিগত যশ-খ্যাতির জন্যও নয়। প্রতিষ্ঠা-কীর্তির চটুল মোহ তাঁর ত্যাগদীপ্ত বৈরাগী মনকে কোন দিন, কোন কালে স্পর্শ করতে পারে নি। সেদিনও করল না। 'যজ্ঞাহুতি হোমশিখার' মত নিত্য ঊর্ধ্বমুখী তাঁর চিত্তবৃত্তিগুলি চিরদিন যেমন তুচ্ছ যশ-অপযশকে, নিন্দা-স্তুতিকে অতিক্রম করে অব্যাহত আনন্দলোকে স্বমহিমায় বিরাজ করেছে,—সেদিনও তাই করল।

'আমার জীবনের বিস্তৃত কর্মপ্রবাহে ভুলভ্রান্তি ত্রুটি বিচ্যুতি যথেষ্ট ঘটেছে—কিন্তু তার জন্য কোন গ্লানি, কোন অনুশোচনা কখনো আমার মনে উদিত হয় নি। কারণ, আমার অকিঞ্চিৎকর শক্তিতে এ-জীবনে ভালোমন্দ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যা কিছু আমি করেছি তা সর্বথা পরার্থে করেছি, নিজের জন্য নয়। স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে কাজ আমার দ্বারা কখনো সাধিত হয় নি।'

তদীয় বিরাট জীবনের যথার্থ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করবার, বহু বিপরীত গুণাবলীর বিচিত্র সমন্বয়ভূমি, তাঁর অলোকসামান্য চরিত্রের নিগূঢ় মর্মকথা উপলব্ধি করবার পক্ষে তাঁর নিজ মুখের এই উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এরই ইঙ্গিতানুসরণে একথা সহজে বোঝা যাবে যে, সেদিন শীত-প্রত্যূষে কলম্বোর বুকে সকল ধর্মের, সকল বয়সের নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত যে আনন্দপ্রকাশ তাঁর জন্য, তাঁকে লক্ষ্য করে উদ্বেলিত হয়েছিল,—সেটি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সংস্কৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য মনে করেই তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন, তৃপ্তি বোধ করেছিলেন।

ভারতের জনগণ ধর্মের নামে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, নিজ প্রাচীন ঐতিহ্যে গর্ব অনুভব করেছে, জড়তার গ্লানি কাটিয়ে উৎসাহ, উদ্দীপনায় জাগতে চাইছে—এই সম্ভাবনার আনন্দই তাঁকে উৎফুল্ল করেছিল সেদিন।

কলম্বোর বার্ণস্ ষ্ট্রীটে বিরাট জনসভায় মানপত্রের উত্তরেও তাই তিনি বলেছিলেন—

অর্থহীন, আভিজাত্যহীন পথচারী এক সন্ন্যাসী আমি। সৈন্যবলে কোন সাম্রাজ্য জয় করে আসি নি, অর্থবলের যে বিশেষ গৌরব ও প্রতিপত্তি তাও আমার নেই। তথাপি, যে বিপুল সম্মানে ও শ্রদ্ধায় কলম্বোর নরনারী আজ আমাকে অভিনন্দিত করেছে—সেটি তাদের অন্তর্নিহিত গভীর ধর্মভাবের প্রেরণায়ই করেছে। তাদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলেই একে আমি গ্রহণ করেছি, অন্য কোন ভাবে নয়।

একথা বুঝতে হবে এবং স্মরণ রাখতে হবে যে ধর্মই ভারতের প্রাণ, ধর্মই ভারতের আদর্শ। ধর্মসাধনাই তার সর্বসাধনার নিয়ামক। যুগে যুগে সেই আদর্শকে পুরোভাগে স্থাপন করেই ভারতবর্ষ এগিয়ে চলতে চেষ্টা করেছে। আবার উত্তরকালেও যদি পৃথিবীর বুকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মর্যাদায় তাকে বাঁচতে হয় তবে সেই ধর্মকে অবলম্বন করেই, জীবন্ত করেই বাঁচতে হবে।

সেদিন সে দিব্যবাণী শ্রদ্ধাবনতচিত্তে কলম্বো শ্রবণ করেছিল, উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছিল তার তাৎপর্য।

তারপর কলম্বো থেকে কাণ্ডী, কাণ্ডী থেকে অনুরাধাপুরম্ হয়ে জাফ্না গিয়েছিলেন স্বামীজী। কিন্তু, যেখানেই যখন গিয়েছিলেন—সর্বত্রই অভাবিত উৎসাহ-চঞ্চলতা, সর্বত্রই বিপুল

সম্মান ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে অপেক্ষমান ছিল মহতী জনতা। নূতন যুগের অভ্যুদয় আসন্ন হয়েছে ভারতবর্ষে। দিগন্ত সীমানায় কালান্তরের চিহ্ন সুস্পষ্ট দৃশ্যমান। তাদের চোখে-মুখে যেন তারই প্রত্যাশা পরিস্ফুট। আর সেই প্রত্যাশা-চঞ্চল জনপ্রবাহের ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন মূল ভারত-ভূখণ্ডের দিকে—মাদ্রাজের দিকে।

অবশেষে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী—ভারতবর্ষের পুণ্যমাটিতে, পাম্বানে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

২৬শে জানুয়ারী। উত্তরকালে ভারতবর্ষের মুক্তি-ইতিহাসে যে রক্তলিখায় চিহ্নিত হয়েছিল এই দিনটি, লক্ষ লক্ষ নরনারীর বন্দনায় ও শত শত শহীদের অকল্পিত আত্মাহুতিতে যে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সে লাভ করেছিল—কে জানে তারই আগমন-ইঙ্গিত নিহিত ছিল কি না—নবযুগের বেদমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে ঐ বিশেষ দিনে স্বামীজীর ভারতের মাটিতে প্রথম পদক্ষেপের মধ্যে!

আমরা জানি না, কেউই হয়ত জানে না—কিন্তু ঘটনার অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত যোগাযোগ বস্তুত অমনি ঘটেছিল!

২৬শে জানুয়ারী, সিংহল থেকে মাদ্রাজে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন স্বামীজী।

*　　*　　*　　*

মাদ্রাজ!

যে মাদ্রাজ চার বৎসর পূর্বে একদা কীর্তিহীন, খ্যাতিহীন বিবেকানন্দকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে, ধর্ম ও অধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিভূরূপে পাশ্চাত্যদেশে প্রেরণ করবার কাজে অগ্রণী

হয়েছিল,—যেখানকার যুবসমাজ সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল শুদ্ধ তাঁর চরিত্রের শুভ্রতা দেখে, স্তম্ভিত হয়েছিল তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞান-গভীরতা দেখে, অভিভূত হয়েছিল তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের অমিত প্রভাব দেখে,—

আজ পাশ্চাত্যবিজয়ের পর সেই মাদ্রাজে স্বামীজীর প্রথম পদার্পণ যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

তাই দেখি, সমগ্র মাদ্রাজ যেন অধীর আনন্দে উল্লসিত হয়ে অপূর্ব অভিনন্দন জানিয়েছিল স্বামীজীকে।...

সর্বত্র কী অবিশ্বাস্য জনসমাগম! পথে পথে গৃহচূড়ায়, গবাক্ষে, অলিন্দে—সর্বস্থানে, অগণ্য নরনারীর কী অভূতপূর্ব সমাবেশ! ফাঁক নেই, তিলধারণের স্থান পর্যন্ত নেই।

সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসীকে শুধু একটিবার দর্শন করবার জন্য সে কি অসম্ভব চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা! বহুশতাব্দীর অন্তে ভারতের মাটিতে সে এক সম্পূর্ণ নূতন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

তারপর যথাসময়ে বিরাট জনসভার আয়োজন ক'রে ভিক্টোরিয়া হলে সমগ্র মাদ্রাজবাসীর পক্ষ থেকে মানপত্র দেওয়া হল তাঁকে।

উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে সেই সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন তিনি তাঁর কর্মপন্থা, তাঁর সমরনীতি—'মাই প্লান অব্ ক্যাম্পেইন'।

*   *   *   *

মানুষ চাই,—খাঁটি, অকপট মানুষ! আশিষ্ঠ যারা, দ্রঢ়িষ্ঠ,

বলিষ্ঠ যারা, অবিচল শ্রদ্ধায় আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করতে যারা প্রস্তুত—এমন মানুষ। তাদের প্রতিই ছিল তাঁর প্রথম উদাত্ত আহ্বান !

যদি এমন একশত খাঁটি যুবক এগিয়ে আসে—সর্বস্ব ত্যাগ করে এগিয়ে আসে—তবেই জাগবে ভারতবর্ষ। দুঃখের নিরন্ধ্র তমিস্রা বিদীর্ণ ক'রে আলোক-রশ্মি তবেই প্রতিফলিত হবে তার আকাশে ও আঙিনায়।

ধর্মের দেশ আমাদের এই মাতৃভূমি। যুগে যুগে অধ্যাত্ম সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে পুষ্ট হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে তার ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন। 'যদ্ যদ্ পশ্যসি তদ্বদ'—এইটিই এদেশের ধর্ম-সাধনার মর্মকথা। সেই ধর্মকে পুনর্বার দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

The country must be flooded with religion and spirituality.

জ্ঞান দাও, শিক্ষা দাও; রুদ্ধবাতায়ন অবারিত করে দাও। শিক্ষার আলোকধারায় দেশের পুঞ্জীভূত গ্লানি বিদূরিত হবে। বক্ষের পঞ্জর দিয়ে সেই আলোর আধারটিকে দিনে দিনে, তিলে তিলে গড়ে তোল। মনে রেখ, শিক্ষাই সর্বব্যাধির মহৌষধি।

Education is the panacea of all evils.

উপনিষদের প্রাণদমন্ত্রে দীক্ষিত কর, উদ্বুদ্ধ কর ভীত, আর্ত অনড় জাতিকে।

The shining, strengthening and the bright philosophy of Upanishads ...

তাকে গ্রহণ কর, অনুসরণ কর। জীবনে ও কর্মে প্রতিফলিত কর।

ভারতের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। জাতির উন্নতি অপ্রতিরোধ্য।

দেশপ্রেম! হে দেশকর্মিগণ, হে সমাজ সংস্কারকগণ!—কাকে বল দেশপ্রেম? কি তোমাদের প্রেটিয়টিজম্?

দেশপ্রেম সম্বন্ধে আমার নিজস্ব একটি মতবাদ আছে।

I have my own idea of patriotism.

দেশের জন্য যথার্থই কি তুমি অনুভব কর? তীক্ষ্ণভাবে, তীব্র ভাবে? গভীর অথই জলের নীচে সবলে চেপে ধরলে রুদ্ধ-নিঃশ্বাস কোন মানুষের যে মর্মান্তিক অবস্থা ঘটে,...দেশের বহুযুগ সঞ্চিত দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা ক'রে তেমনি অবস্থা কি তোমার ঘটেছে? —তেমনি বেদনায় মুমূর্ষু? মৃত্যুযন্ত্রণায় তেমনি একান্ত অধীর? তা যদি হয়ে থাকে, তবে দেশ-সেবার প্রথম ধাপে মাত্র তুমি পা দিয়েছ, এক তৃতীয়াংশ যোগ্যতা অর্জন করেছ।

এরপর সেই তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে বজ্রদৃঢ় নিষ্ঠায় বাধাবিঘ্নের পাষাণপ্রাকার ভগ্ন করে, ধূলিসাৎ করে অদম্য সাহসে এগিয়ে যাবার জন্য কি তুমি কৃতসঙ্কল্প হয়েছ? সমগ্র পৃথিবী যদি তোমার বিপক্ষে

যায়, আত্মীয় স্বজন তোমাকে দূরে পরিহার করে, তুমি একান্ত নিঃসঙ্গ ও একান্ত একক হয়ে পড়, তথাপি কি তুমি নিজ লক্ষ্যমুখে —অবিচল সঙ্কল্পে অগ্রসর হতে প্রস্তুত হয়েছ ? যদি হয়ে থাক, তবে দ্বিতীয় ধাপে তোমার পা দেওয়া হয়েছে। তুমি দুই-তৃতীয়াংশ যোগ্যতা লাভ করেছ।

তারও উপর আবার...

একটি সুচিন্তিত, পূর্বাপর সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা কি আবিষ্কার করেছ তুমি ? যে পন্থার আরম্ভ থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত প্রতিটি স্তর, প্রতিটি অভিব্যক্তি তোমার মানসক্ষেত্রে গভীর রেখায় চিত্রিত, যার মধ্যে অস্পষ্টতা নেই, অবাস্তব অনুমানের অশিচয়তা নেই—এমন পন্থা !

যদি এই তিনটির যুগপৎ সমাবেশ তোমার জীবনে ও চরিত্রে, কল্পনায় ও প্রয়াসে ঘটে থাকে—তবেই সার্থক হবে তোমার দেশপ্রেম, ফলপ্রসূ হবে তোমার পেট্রিয়টিজম্ নতুবা, ফাঁকা কথা আর সংবাদ-পত্র মারফৎ নিজের ঢক্কানিনাদ !—দুর্ভাগা ভারতবর্ষে সে নাটকীয় প্রহসন যথেষ্ট হয়েছে। এবার সেটি বন্ধ করতে হবে।

*   *   *   *

হায়! আমাদের জাতীয় জীবনের বহু-পুরাতন খেয়াতরীটি আজ সহস্র সহস্র বৎসর ধরে, লক্ষ কোটি নরনারীকে জীবন-জলধি পার করিয়েছে। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে, রৌদ্র-বৃষ্টি কড়কাপাতের তীব্র আঘাতের মধ্য দিয়ে জ্যোতির্ময় আনন্দ-সৈকতে তা'দিগকে উত্তীর্ণ করেছে।

আজ দুর্যোগ-বিপাকে প্রাচীন ও জীর্ণ সেই খেয়াতরীটি আমাদের কল্যাণ-হস্তস্পর্শে, আমাদের শ্রমসাহায্যে পুনর্বার কার্যক্ষম হবার, নবকলেবর ধারণ করবার আকাঙ্ক্ষা রাখে, আশা রাখে।

অভিসম্পাতের মধ্য দিয়ে নয়, অপরের দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটনের বহুনিন্দিত পন্থায় নয়—পরন্তু প্রেম ও প্রীতির অমৃত নিষেকে, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার অমোঘ শক্তিতে—সেই পুরাতন, জীর্ণ খেয়াতরীকে নূতন করে সাজিয়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ কর।

পথ প্রদর্শন করবেন ভগবান, সহায় হবেন গণদেবতা।...

অতি সংক্ষেপে, স্বামীজীর প্রথম ভাষণের এই মর্মকথা।

কিন্তু শুধু এইটিই নয়।

ভারতের ঋষিকুল...

বাস্তব জীবনে বেদান্ত

ভারতের ভবিষ্যৎ...

—প্রভৃতি আরও তিন চারিটি বক্তৃতা তিনি সেবার প্রদান করেছিলেন মাদ্রাজে।

তাঁর অগ্নিবাণীর বহ্নিকণার তপ্ত স্পর্শে অকস্মাৎ আত্মসম্বিৎ প্রাপ্ত হয়েছিল যেন মাদ্রাজ। বহুকাল-বিস্মৃত অতীত ঐতিহ্য যেন নূতন করে তার কাছে অশেষ গৌরব ও মর্যাদার বস্তু বলে প্রতিভাত হয়েছিল।

বস্তুত, সেবার নয়দিন মাত্র মাদ্রাজে অবস্থান করে সে প্রদেশ-বাসীকে—নয় শতাব্দীর দীর্ঘপথ যেন অতিক্রম করিয়েছিলেন স্বামীজী।

গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতায় কুখ্যাত মাদ্রাজ—তাঁর শক্তিপূর্ণ দিব্যস্পর্শে নবযুগের সিংহদ্বারে উত্তীর্ণ হয়েছিল যেন নয়দিন মাত্র সময়ে। নবরাত্রির সে যেন এক শুভ জয়যাত্রা।

নয়দিন পরে আবার স্বামীজী যাত্রা করলেন জাহাজে, বঙ্গোপসাগর পথে।

এবার লক্ষ্য নদী-মেখলা বাংলা, বাংলার কেন্দ্রস্থান মহানগরী কলিকাতা।

* * * *

বাংলা দেশ।

তাঁর স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্য জন্মভূমি। যার মাটির সঙ্গে বত্রিশ নাড়ির নিগূঢ় সংযোগ ছিল স্বামীজীর—সেই শ্যামসরস সোনার জন্মপীঠ তাঁর বাংলা। যার দর্শন মাত্রে অন্তরে ধ্বনিত হয় সঙ্গীত…

'সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ
তোমার বাতাস
আমার কাণে বাজায় বাঁশী।'

একদিন দু'দিন নয়, প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্বে—একদিন একবস্ত্রে নগ্নপদে দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে কলিকাতা ত্যাগ করে, বাংলা দেশ ত্যাগ করে, সংসারের সকল বন্ধন ও স্নেহসম্পর্ক ছিন্ন করে পরিব্রাজক বেশে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেড়িয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ।

সেদিন, তমসাবৃত, অজ্ঞাত-ভবিষ্যতের দীর্ঘ, অনিশ্চিত দিবসগুলি নীরবে অপেক্ষমান ছিল সম্মুখে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, নিশ্চিত-অনিশ্চিতের ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্ত ছিল উদ্বেগাকুল। কেবল ভিতরের প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি ও অটল আত্মবিশ্বাস মাথা কুটে মরছিল অভিব্যক্তির পথসন্ধানে।

প্রার্থনা ছিল…'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে।'

Someday I shall fall upon the society like a thunderbolt…এই ছিল উক্তি। এই ছিল মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার একমাত্র বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু কবে অথবা কীভাবে সমাগত হবে সেইদিন, তা কেবল জানতেন ভাগ্যবিধাতা, জানতেন কেবল সর্বকালদর্শী যিনি, সেই পুরুষ-প্রধান।

আর আজ!

আজ দ্বাদশ বৎসর পরে—মানবসমাজের অশেষ সৌভাগ্যবশে সেইদিন সত্যি হয়েছে সমাগত।

কেবল বাংলা দেশের নয়, কেবল ভারতবর্ষের নয়, পরন্তু সমগ্র সভ্যজগতের চিন্তাক্ষেত্রে অভিনব আলোড়নের সৃষ্টি করে—

বস্তু থেকে ভাবে,…

স্থূল থেকে সূক্ষ্মে,…

ভোগ থেকে ত্যাগে,…

মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে,…

যুগের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে চালিত করবার সার্থক প্রয়াসে নবযুগের উদ্বোধন করে স্বদেশের বুকে প্রত্যাগত আজ স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বাগত, সু-স্বাগত হে মহামনীষি!

সমগ্র কলিকাতা, সমগ্র বঙ্গদেশ আজ তাই নিজ বিজয়ী বীর-সন্তানকে দেখবার জন্য, অভিনন্দিত করবার জন্য মাদ্রাজের চাইতেও অধিকতর উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হয়ে যেন অপেক্ষা করছিল।

তারপর ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একটি স্নিগ্ধ শিশিরস্নাত শীতের প্রভাতে—তপস্যাদীপ্ত, প্রসন্ন-শ্রী স্বামীজী পদার্পণ করেছিলেন বাংলায়, মহানগরী কলিকাতায়।

*　　　*　　　*　　　*

এখন থেকে অর্ধ শতাব্দীকালেরও পূর্বেকার কথা আমরা বলছি···

তখনকার কলিকাতায় আজকের মত এত ব্যাপক কৃত্রিমতা ছিল না। আসলের চাইতে নকলের দাম তখনো এত বেশী উপরে ওঠেনি!

ভূয়া প্রোপাগ্যাণ্ডা আর রেডিও মারফৎ আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ তখনও মহানগরীর আকাশ-বাতাস আজকের মত দূষিত, বিষাক্ত করে তোলে নি।

সর্বগ্রাসা রাজনীতির শত-বিচিত্র লূতাতন্তু তখনো দেশের চিন্তাধারাকে এমন কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেনি, তার সহজ বুদ্ধিকে আবিল করে দেয়নি।

তখনো শুদ্ধমাত্র ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, আগ্রহ ও শ্রদ্ধার স্বতঃ-স্ফূর্ত প্রেরণায় দলবদ্ধভাবে কোন সৎকাজে এগিয়ে যাবার শক্তি ছিল এই মহানগরীর।

লাউড্ স্পীকারের মারফৎ সত্য-মিথ্যায়-মিশ্রিত অভিসন্ধিপূর্ণ নির্দেশ ছাড়াও দিক্-নির্ণয়ের সামর্থ্য ছিল তার। অলিতে গলিতে এত জননেতারও অভ্যুদয় তখনও ঘটেনি।

তাই, সেই পুণ্যশ্লোক মনীষীকে দেখবার জন্য, সেই ঋষিকল্প, দেশ-প্রাণ যোদ্ধ্ পুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য কলিকাতার পথে পথে, চৌরাস্তার সংযোগস্থলে, শিয়ালদহ ষ্টেশনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে হাজার হাজার নরনারীর বিরাট সমাবেশ ঘটেছিল সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে – সংবাদপত্র আর রেডিও-প্রচারের সহায়তা ছাড়াই।

ফলে-ফুলে, মাল্যে-স্তবকে—আচ্ছাদিত করেছিল তারা স্বামীজীকে। ঘোড়া খুলে দিয়ে ছেড়ে নিজ হাতে টেনেছিল তাঁর শকটখানি। অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় সমগ্র মহানগরী যেন একযোগে প্রণতি জ্ঞাপন করেছিল সেই দেবতুল্য অগ্নিমন্ত্র মনীষীকে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য, বিচিত্র প্রেরণা।

এরপর – যথাসময়ে আহূত হয়েছিল আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা সভা। শোভাবাজারের এক সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে ছয়-সাত হাজার বিশিষ্ট পৌর-বাসী সম্মিলিত হয়ে সভক্তি মানপত্র প্রদান করেছিল স্বামীজীকে।...

একথা আমরা পূর্ব্বে বলেছি, স্বামীজীর উক্তির বিবৃতি প্রসঙ্গেই বলেছি, কোন রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না স্বামী বিবেকানন্দ, কোন রাজ্য-বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষও ছিলেন না তিনি।

তথাপি, সেই ষাট-সত্তর বৎসরের পূর্বেকার অর্ধজাগ্রত ভারত-বর্ষেই সহস্র সহস্র নরনারী শ্রদ্ধাঞ্জলিপুটে, ভক্তিবিনম্রচিত্তে এই সর্বত্যাগী যতীকে অভাবিত সম্মান দেখিয়েছিল, গভীর ও অকপট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিল।

সে ব্যাপারের মধ্যে ভারতেতিহাসের যে মর্মকথাটি লুক্কায়িত আছে—তার আশা-আকাঙ্ক্ষার যে মূর্তিটি প্রকাশমান—তারি দিকে আধুনিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যেই সেই সব অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভিবাদনের কিঞ্চিৎ বিশদ বিবরণ আমরা প্রদান করলাম। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

* * * *

কলিকাতায় পৌরবাসীদের মানপত্রের উত্তরে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন স্বামীজী শোভাবাজারের সেই মহতী সভায়। বাংলাদেশ তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত শান্তিবাণীর অমরছন্দ সেই প্রথম প্রত্যক্ষ-শ্রবণে শুনতে পেয়ে ধন্য হয়েছিল, উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

ধর্মতত্ত্বের কোন বিশদ ব্যাখ্যায় তিনি অগ্রসর হননি সেদিন। ভাবী কর্মধারার বিস্তৃত কোন পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেননি সে সভাতে। শুধু অকুণ্ঠিত প্রণাম জানিয়েছিলেন নিজ মাহন গুরুকে— যাঁর পাদস্পর্শে এ-যুগে ধন্য হয়েছে বাংলা, ধন্য হয়েছে ভারতবর্ষ, ধন্য হয়েছে জীবধাত্রী পৃথিবী।

যাঁর পুণ্য আশীর্বাদ ও অভ্রান্ত ইঙ্গিতে জীবনের উদ্দেশ্য ও পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি স্বয়ং। আর অকৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করেছিলেন পরিপূর্ণ অন্তরে, প্রাণপ্রিয় তাঁর দেশবাসীকে, কলিকাতার নাগরিকদিগকে,—যে কলিকাতার ক্রোড়ে তাঁর জন্ম, যার ধূমধূলির স্পর্শে বর্ধিত ও পুষ্ট তাঁর শৈশব-শরীর।…

তারপর, অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষে সিংহবীর্য সেই পুরুষ সমগ্র-জাতির আত্মিকশক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য, অন্তরের সুপ্ততেজ প্রদীপ্ত করবার জন্য হেনেছিলেন প্রচণ্ড আঘাত।

কী সে ওজস্বিনী ভাষা, কী সে মর্মভেদী আবেদন! স্তব্ধবিস্ময়ে আজিকার ক্ষুব্ধ আকাশে কান পেতেও সেই অমিতবীর্য, শাশ্বত, সনাতন বাণীর প্রতিধ্বনি আমরা যেন শুনতে পাই।….

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,…

'দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ?'

Youngmen of Calcutta—arise, awake, for the time is propitious. Be bold and fear not…

তমিস্ররজনীর ভীতিবিত্রস্ত দুর্বলতা দূরে নিক্ষেপ কর।

দারিদ্র্যে ভয় পেয়ো না, অসহায় নির্বান্ধব অবস্থা তোমার নয়।

আমার দেশবাসীর উপর আমি আশা রাখি, আশা রাখি তরুণ সম্প্রদায়ের উপর।

বাংলার যুবক সম্প্রদায় নিজ স্কন্ধে অতি গুরু দায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতা রাখে এ আমি নিশ্চিত জানি।

ঐ শোন…'অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ।'…

Think not that you are poor, that you have no friend…I have faith in my countrymen, and especially in the youth of my country…

The youths of Bengal have the greatest of all tasks that have ever been placed on the shoulders of youngmen…

সুতরাং, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত।

এই বাংলার তরুণের-রক্তে অনুভূতি আছে, উদ্দীপনা আছে। তাদের মধ্য থেকেই বীরের দল জাগ্রত হবে—ধরিত্রীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মের অমৃত-মন্ত্র তারাই প্রচার করবে, শিক্ষা দেবে।…এইত কাজ…

Aye, from the youth of Bengal with the immense amount of feeling and enthusiasm in the blood, will come the heroes, who will march from one corner of the earth to the other, preaching and teaching the eternal spiritual truths of our forefathers. And this is the great work before you…

বাধা যত প্রচণ্ডই হোক, বিপদের ঘূর্ণিবাত্যা যত প্রবলতায়ই আত্মপ্রকাশ করুক—উন্নত মস্তকে ও নির্ভীক প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হও।…ভয় নেই।

Mountain high though the difficulties appear, terrible and gloomy though all things seem, they are but Maya.

Fear not, it is vanished. Crush it and it vanishes. Stamp upon it and it dies.

এমনি নির্ভীক সুর ও নব-যুগের নব-বার্তা স্পেশাল মেসেজ—কয়েকটি সুবিখ্যাত বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে এই সময় ঘোষণা করেছিলেন তিনি বাংলাদেশে।

সে-সকল অব্যর্থ অমোঘবাণীর ফল ফলতেও অবশ্য বিলম্ব ঘটেনি। বস্তুত, কতকাল, কতযুগ ধরে পরাধীনতার গুরুভারে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়েছিল বাংলা, ঘুমিয়েছিল তামাম হিন্দুস্থান। ভাবের নদীতে তার জোয়ার আসত না, নবকিশলয়ে সজ্জিত হত না তার উদ্যান-বীথিকার তরুলতা।

আজ অকস্মাৎ সঞ্জীবনী মন্ত্রের আমোঘ প্রভাবে, জ্বারকরসের পর্যাপ্ত সিঞ্চনে সমগ্র জাতির জীবনে এসে গেল যেন বিপুল প্লাবন, উন্মত্ত জোয়ার।

শিরায় শিরায় উষ্ণ-শোণিত প্রবাহে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল যেন সারা দেশ। ক্ষণিক উত্তেজনার কোন অর্থহীন উচ্ছল অভিব্যক্তি নয়, পরন্তু, নিদ্রোত্থিত জাতির জীবন-চঞ্চলতার সত্যিকার প্রকাশ সেটি। উত্তরকালে, ধীরে ধীরে তার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানা সাধনক্ষেত্রে যে শক্তি ও উদ্বুদ্ধ চেতনা তাকে কঠোর আত্মত্যাগে ও মহান প্রযত্নে নিয়োজিত করেছিল—যার প্রভাবে বাধামুক্ত হয়েছিল তার জয়যাত্রার 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা'—সে শক্তিরই সার্থক উদ্বোধন ছিল সেটি।

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ পরবর্তীকালে তাই লিখেছিলেন…

উত্তরকালে বিবেকানন্দের দেহত্যাগের তিন বৎসর অন্তে কেউ যদি বাংলার প্রথম বিপ্লব আন্দোলন দেখে থাকে, যদি অনুধাবন করে থাকে যে এরই উত্তর-পরিণতি—তিলক ও গান্ধীর ব্যাপক গণ-আন্দোলন, তবে সে অবশ্য উপলব্ধি করতে পারবে যে এ সবের মূল প্রেরণাটি এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে, প্রারম্ভিক নির্দেশটি এসেছিল সেই বিরাট পুরুষেরই সবল দক্ষিণ হস্ত থেকে।

If the generation that followed, saw, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal—the prelude to the grêat movement of Tilak and Gandhi —it is due to the initial shock that it received from Vivekananda···

এমনি করে, কালে কালে —মহৎজীবনের নিষ্কাম প্রয়াসে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত উন্নতি যেমন ভাবে সাধিত হয়েছে সর্বদেশে—তেমনি করেই স্বামীজীর মর্মস্পর্শী আবেদনে আর তাঁর ভাস্বর জীবনের অনতিক্রম্য আকর্ষণে—কর্মের পথে, আত্মোৎসর্গের পথে যাত্রা করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল উদ্‌বুদ্ধ, উদার যুবকদল, জাতির প্রতিনিধি-স্থানীয় সেই খাঁটি মানুষের দল, যারা স্বামীজীর অতি প্রিয় প্রাণের বস্তু ছিল, দেশের ছিল ভবিষ্যতের আশা ও ভরসা স্বরূপ।

ফলে, সেই তীব্র ও ব্যাপক কর্মৈষণাকে সুসংহত করে ফলপ্রসূ পথে নিয়োজিত করবার জন্য এই সময় একটি শক্তিশালী সঙ্ঘ গঠন করবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন স্বামীজী এবং অচিরে অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে, গুরুভাইদের নিয়ে এবং উৎসাহী কর্মীদের নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের করেছিলেন উদ্বোধন,—যে মঠ ও মিশন বিশিষ্ট উপায়ে ব্যক্তিগত সাধনাকে জাতিগত সাধনার সঙ্গে করবে একীভূত, বনের বেদান্তকে ঘরের ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে

'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' যুগোপযোগী সঙ্ঘরূপে হবে ক্রিয়াশীল।

আজ কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী কাল মধ্যে সে সঙ্ঘেরই শাখা-প্রশাখা পূর্ব গোলার্ধের এক প্রান্ত থেকে পশ্চিম গোলার্ধের অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। জনসেবার বিভিন্ন পন্থার মধ্য দিয়ে, ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার মর্মকথা প্রচারের মধ্য দিয়ে আপনার সার্থকতাও সে বহুলাংশে প্রমাণ করছে।

কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড় কথা,...অনেক বেশী আশার কথা এই যে, সেই সঙ্ঘেরও গণ্ডী বহুদূর অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বল জীবনাদর্শ এবং বিবেকান্দের যুগবাণী আজ সমগ্র সভ্য জগতের চিন্তাক্ষেত্রে দৃশ্য ও অদৃশ্য পথে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। ধর্মে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে—প্রগতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পেয়ে আমরা বিস্মিত হচ্ছি, আশান্বিত হচ্ছি। যদিও তাদের বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে আমরা করতে পারছি না।

সুতরাং সে কথা এখন থাক।...

আমরা স্বামীজীর বাংলাদেশে প্রথম পদার্পণের কথা বলতে গিয়ে এ-প্রসঙ্গে এসে পড়েছিলাম। সন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের সে-কথা।

ফেব্রুয়ারী থেকে মে,—প্রায় তিন চার মাস কাল, এই সময় তিনি বাংলা দেশে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় মধ্যে বিরামহীন, বিশ্রামহীন প্রয়াসে—কর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে ক্লান্ত-দেহ স্বামীজী কতকটা বিশ্রামের আশায়, আর কতকটা উত্তর-ভারতে তাঁর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন হিমশীতল হিমগিরির যার ্,—সন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে। এবং পথে পথে পন্থা' ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিলেন ম গন্তব্য স্থলের অভিমুখে।

কলম্বো থেকে আলমোড়া—ভারতের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে উত্তর সীমান্ত অবধি—এমনি করেই প্রচারিত হয়েছিল তাঁর অগ্নিময় যুগবাণী, ঝঙ্কৃত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে জাতির সাধনা ও সঙ্কল্পের নূতন অভিব্যক্তি, নূতন ব্যাখ্যা।

Everyman is potentially divine. Every man is potentially Brahman···

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন···

সেই ব্রহ্মচেতনা, সেই সুপ্ত ভাগবৎ-শক্তি জাগ্রত করবার নিরলস সাধনাই ধর্মসাধনা। এই তাঁর বাণীর প্রথম ও প্রধান সূত্র। ভারতবর্ষ সেই সাধনারই ভিত্তিতে তার সকল প্রয়াসকে গ্রথিত করতে, রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছে যুগে যুগে ··

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—

এই তত্ত্বটি সম্যক উপলব্ধি করে পরমার্থের অব্যাহত আনন্দধারায় অবগাহন করবার উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে সে জপ করে এসেছে সেই একই মন্ত্র—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন,
ন বিভেতি কুতশ্চন।···

রাজনৈতিক কীর্তি বা প্রতিপত্তি, সামরিক আধিপত্য বা প্রতাপ,—এ সব কোনকালে ভারতবর্ষ তার জাতীয় জীবনের আদর্শ-রূপে গ্রহণ করে নি, ভাবীকালেও করবে না।

Political greatness or military power was never the mission of our race....and mark my words, it will never be.

অতএব, ত্যাগের ভিত্তিতে এবং মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে আত্মিক-শক্তির বিকাশ-প্রচেষ্টাতেই তাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর বাকী যা কিছু প্রয়োজন তা স্বতঃই এসে যাবে।

Renunciation and Service are the national ideals. Intensify her in those channels and the rest will take care of itself···

Aggressive Hinduism is the spiritual basis and the masses form the material basis—

God and truth are the only politics···all else is trash.

তথাকথিত রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। ভগবান এবং সত্যই আমার রাজনীতি···আর সব অসার, মিথ্যা···

শ্রদ্ধাহীন হয়েই, আত্মবিশ্বাস হারিয়েই পতিত হয়েছে জাতি। নীচ স্বার্থপরতা আর সঙ্কীর্ণ মনোভাব আমাদের সর্বনাশ সাধন করেছে। সেই পাপ, সেই গ্লানি স্খালন করে—উদ্বুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ. হে, অমৃতের সন্তানগণ—ওঠ, জাগ,···

দেখ, পূর্ব-দিগন্তে আলোক-শিশুর প্রসন্ন আবির্ভাব সহস্র বর্ণ-বৈচিত্র্যে সূচিত হচ্ছে। এখন কি নিদ্রার অবসর আছে?

'ভগবান, ভগবান' করে, 'ধর্ম 'ধর্ম' ক'রে কোন্ তুচ্ছ অর্থহীন সংস্কারপুঞ্জের পিছনে পিছনে ছুটে চলেছ বদ্ধদৃষ্টি ভারতের নরনারীর দল।···

শোন বলি মরমের কথা জেনেছি জীবনে সত্য সার,
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর--এক তরী করে পারাপার।
তন্ত্র-মন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন,— ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম
প্রেম, প্রেম—এইমাত্র ধন।...

- সেই বিশুদ্ধ, কাম-গন্ধ-হীন প্রেমকে জাগ্রত কর অন্তরে।
ভাস্বর-জ্যোতি ব্রহ্মকে প্রকাশ কর, নিরাবরণ কর সাধনায়।
আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য বিস্মৃত হও অন্য সকল দেবতা, অন্য যাবতীয় ভগবান;...
আরাধনা কর সেবা কর—সেই একমাত্র দেবতাকে, যিনি—
'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।
যিনি নিত্য, ..'বহুরূপে সম্মুখে তোমার।' ·

What vain God shall we go after and yet cannot worship the God that we see all around us—Our Own Race...the Virat ?

যদি ভাল চাও তবে ঘণ্টাফণ্টাগুলো গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের, মানবদেহধারী মানুষের পূজা করগে; —বিরাট আর স্বরাট।

বিরাট রূপ এই জগৎ— তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম, ঘণ্টার উপর চামড় চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব, কি আধঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম নয়, ওর নাম—পাগলা গারদ।

জ্ঞানের আলো নিয়ে, শিক্ষার আলো নিয়ে...পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়। মনে রেখো, শিক্ষাই সর্ব ব্যাধির মহৌষধি।...

আবার, শুধু যুবশক্তি বা জন-সাধারণের উদ্দেশেই নয়, নারী-সমাজের উদ্দেশেও তাঁর অনুরূপ বাণী ছিল।

ভারতবর্ষকে বিশ্বাস কর, তার জীবন-দর্শনের নিগূঢ় তাৎপর্যকে বিশ্বাস কর। শক্তি অর্জন কর, নিরাশা ও কুণ্ঠা বর্জন কর। মনে রেখো, জগতের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে ভারতবর্ষ যেমন অমূল্য সম্পদ দান করতে পারে তেমনটি আর কোন দেশ পারে না।

Believe in India and in our Indian faith. Be strong and hopeful and unashamed and remember that with something to take—Hindus have immensely more to give than any other people in the world.

অন্যদিকে, ভারতবর্ষের যে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য একদা দেশ-দেশান্তরে, দূর-দূরান্তরে—পাহাড়গিরি, মরু-কান্তার অতিক্রম ক'রে তার সাধকগণ প্রচার করত—সেই অক্ষয়, অনবদ্য সম্পদ আবার হিংসামত্ত, সংশয়-ক্ষুব্ধ পৃথিবীতে বিতরণ করবার জন্য—বহির্গত হও, হে আর্য বংশধরগণ! নববাংলার ভাব-সমৃদ্ধ-জীবনের উত্তরসাধকগণ।...

বড়লোক বা ধনীর সাহায্যের প্রত্যাশা করো না। জগতে দরিদ্ররাই যুগে যুগে মহৎ কর্মের অনুষ্ঠান করেছে।

অকপট হও, আদর্শে বিশ্বাস কর, আর দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চল।

Ye, youngmen of Bengal do not look up to the rich and great men who have money.

The poor did all the great work of the world. Be steady, and above all, be pure and sincere to the backbone...Have faith in your destiny.

নীরবে, নিঃস্বার্থভাবে বিনম্র চিত্তে ব্রতী হও,—সিদ্ধি অবশ্য করায়ত্ত হবে।

Calm and silent and steady work and no newspaper humbug, no name-making You must always remember…

এই প্রকার তেজোদ্দীপ্ত বাণী আর অগ্নিগর্ভ আবেদনের মধ্য দিয়ে সচেতন করেছিলেন তিনি জাতিকে, নিরলস কর্ম-সাধনায় প্রবুদ্ধ করেছিলেন ভারত-ভারতীকে।

জাতির জয়যাত্রার সপ্তাশ্ববাহিত রথচক্র এমনি করেই স্বামীজীর জীবন্ত, জ্বলন্ত প্রেরণায়—উদয়-দিগন্ত থেকে শুরু করেছিল তার ঐতিহাসিক অভিযান বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে এবং কর্মমুখর ধর্ম ও ধর্মাশ্রিত কর্মের আদর্শ-পথে ধাবিত হয়েছিল তাঁরই অভ্রান্ত অঙ্গুলি সঙ্কেতে।

* * * *

কলিকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে, কাঠগুদাম ছুঁয়ে, পৌঁছেছিলেন স্বামীজী আলমোড়ায়। আবার আলমোড়ায় কয়েকদিন থেকে বেরেলী হয়ে, মুরী হয়ে…গিয়েছিলেন ভূস্বর্গ কাশ্মীরে।
কাশ্মীর থেকে পুনঃ লাহোর হয়ে ক্ষেত্রী, কিষেণগড়, আজমীড়, যোধপুর—এক কথায়, প্রায় সমগ্র রাজপুতনা পরিভ্রমণ করে প্রায় ছয় সাতমাস কাল অন্তে ফিরেছিলেন স্বামীজী কলিকাতায়—সন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, জানুয়ারীতে।

* * *

'গঙ্গার পশ্চিমকূল,
বরাণসী সমতুল।'—

সেই পশ্চিমকূলে, বেলুড় গ্রামে, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ তখন তার নিজস্ব মঠ-বাটীতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সেইখানে শুরু হয়েছে সংগঠনের কাজ, মানুষ তৈরীর কাজ।

Imparting of the man-making, life-giving and character-building education.

স্বামীজীর যোগ্য গুরুভ্রাতাগণ নবাগত যুবক কর্মীদের গ'ড়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তখন, ইউরোপ-আমেরিকা থেকেও—ভগিনী নিবেদিতা, মিস্ ম্যাক্লিয়ড্ প্রমুখ অনেকে—যাঁরা ভারতবর্ষের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন—তাঁরা এসে পৌঁছেছেন।

আলমোড়ার পাহাড়-ঘেরা শান্ত-নীরবতায় স্থাপিত হয়েছে আশ্রম,—'অদ্বৈত আশ্রম।' মাদ্রাজে, মুর্শিদাবাদে কর্মকেন্দ্র স্থাপনেরও চলেছে আয়োজন। প্রতিদিন দলে দলে আসতে শুরু করছে—বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য নরনারী।...দেশের দূর দূরান্ত থেকে—আর্ত যারা, পিপাসু, জিজ্ঞাসু যারা বিভিন্ন কল্যাণ-কর্মের নিষ্ঠাবান সাধক যারা, যাদের স্বপ্ন দূর-দিগন্তে বিসর্পিত, তাদেরও চলেছে অবিশ্রাম আসা-যাওয়া।

এক কথায়, বিশাল ভারতের সদ্য নিদ্রোত্থিত সমষ্টিপ্রাণ—স্বামীজীর নির্দেশের জন্য, আশীর্বাদের জন্য উন্মুখ হয়ে তাঁর চারিদিকে যেন সমবেত হতে শুরু করছে।

তুই হবি বিরাট বটবৃক্ষের মত,— তোর জীবনের যোজন-বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার ছত্র-ছায়ায় শতকোটি তাপিত, আর্ত নরনারী আশ্রয় পাবে শান্তি পাবে।'—তদীয় উত্তর-জীবন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই যে অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী 'যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তা এখন শত বর্ণে ও মাধুর্যে সফলতা লাভ করেছে।

চতুর্দিকে এমনি অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যেই বস্তুত স্বামীজী পুনর্বার ফিরেছিলেন কলিকাতায়।...কিন্তু খুব বেশীদিনের জন্য নয় এবারও। সব শুদ্ধ—তিন চারমাস মাত্র সময়ের জন্য।

তারপর, কতিপয় পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে, মুখ্যতঃ তাদেরই

কার্যকরী শিক্ষার জন্য - আবার তিনি যাত্রা করেছিলেন হিমালয়ের দিকে—আলমোড়া, নৈনিতাল প্রভৃতির উদ্দেশ্যে।…

স্বামীজী বলতেন,— 'আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। তা, আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তটাই চক্কর।'

মহাভারতের আখ্যায়িকায়ও উল্লিখিত আছে যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সর্ব-সুলক্ষণযুক্ত দেহে একটি মাত্র ত্রুটি ছিল, সেটি তাঁর দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন পদযুগল। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, ঐ পদযুগলের জন্যই আজীবন অর্জ্জুনকে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে হচ্ছে।

বাস্তবক্ষেত্রেও তাই দেখি —জীবনভোরই স্বামীজী রমৃতা সাধু, যুগব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সমগ্র জীবনই তিনি পরিব্রাজক। তবু কিন্তু একথা মনে হয় যে, এবারকার তাঁর হিমালয় যাত্রার উদ্দেশ্য প্রথমবার থেকে বহুলাংশেই পৃথক ছিল—লক্ষ্যেও বটে, প্রণালীতেও বটে। তাঁর কর্মক্লান্ত দেহমন হিমালয়ের স্তব্ধ গভীর নীরবতার জন্য যতই উৎসুক হয়ে থাকুক না কেন একালে,—তথাপি সেটি তাঁর এবারকার হিমালয় যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। পরন্তু, নিবেদিতা-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের জন্যই এবার—অতি অল্প সময়ের ব্যবধানেই—কলধ্বনিমুখর মহানগরী ত্যাগ করে, হিমালয়ের নিভৃত নিরালায় প্রবেশ করবার সংকল্প করেছিলেন স্বামীজী।—

কর্মের বহির্মুখীন আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে—শান্ত ও অনুকূল আবহাওয়ায়—ধ্যান-তপস্যার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দান করবেন, ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে তার জাতীয়-জীবনের সুখ-দুঃখের অংশভাগী করে দেবেন তাদের, এইটি ছিল স্বামীজীর এবারকার হিমালয় যাত্রার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটি আরও একটু বিশদ করে বলি।

সংস্কারের সমষ্টি আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন। তাদের গ্রন্থি-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনাসক্ত স্বাধীনতা লাভ—সাধকমাত্রেরই মহাকাঙ্ক্ষিত জীবনস্বপ্ন। এদের মধ্যে আবার জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষাগত যে-সব সংস্কার থাকে সেগুলি সমধিক দৃঢ়মূল, রক্তের ধারার সঙ্গে সমধিক বিজড়িত। অথচ, সেই সব সংস্কারের হাত থেকে মুক্ত হতে না পারলে একদেশের নরনারীর পক্ষে অন্য দেশের সেবাব্রত গ্রহণ করা সম্ভব নয়, এক জাতির লোকের পক্ষে অন্য জাতির লোককে ঐকান্তিক স্নেহ-প্রীতিতে আপন বলে চিন্তা করাও সহজ নয়। সার্বভৌম জীবনদর্শন ঐরূপ মুক্ত ক্ষেত্রের সরসতা না পেলে বিকশিত হয় না। সেইজন্য, এই অতি-দৃঢ় সংস্কার সমূহের বন্ধন থেকে পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের মুক্ত করবার দুরূহ দায়িত্ব এই সময়টিতে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজী।

কত গুরুভার, কত জটিল সমস্যাসঙ্কুল, ভিতর-বাহিরের কত বাধা-বিপত্তিপূর্ণ যে ছিল সে দায়িত্ব, স্বামীজী সেটি সম্যক অবগত ছিলেন।

তথাপি, অপরিহার্য কর্তব্যজ্ঞানে নিজ অনন্যসাধারণ শক্তি এই কার্যেই তিনি নিয়োজিত করেছিলেন এইকালে।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর—The Master As I Saw Him, Notes of Some Wanderings with Swami Vivekananda…প্রভৃতি অমর-রচনায় এ সময়ের অক্ষয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন—ভাবীকালের উত্তরাধিকারীদের জন্য।

নিত্য নূতন তত্ত্বের স্ফুরণে—ভারতের প্রাচীন সভ্যতা,—সাহিত্যে, দর্শনে, পুরাণে, ঐতিহাসিক উত্থান-পতনে—যেমন ভাবে যুগে যুগে অভিব্যক্ত হয়েছে—তারি অভিনব ব্যাখ্যায় তাঁর ধ্যানসিদ্ধ, প্রেমিক মন একান্তভাবে তৎপর হয়েছিল এই কালে।

গভীর ধ্যানতন্ময়তা তাঁকে সম্যক আশ্রয় করেছিল। কোন্ মুহূর্তে, কোন্ তত্ত্ব যে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হবে, উন্মেষিত হবে—তার কোন স্থিরতা ছিল না। তিনি নিজেও বোধ করি পূর্বাহ্ণে সঠিক জানতে পারতেন না। কিন্তু পার্শ্ববর্তী সকলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে সব তত্ত্বোপলব্ধির পরম ও দুর্লভ মুহূর্তগুলির জন্য অপেক্ষমান থাকত সর্বদা।...

কী দিব্য আনন্দে, কী অপার্থিব জ্ঞানসম্ভারে যে সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁদের সেই আলমোড়া-নৈনীতালের বিচিত্র দিনগুলি তা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের পূর্ববর্ণিত দিনগুলিরই আর এক অনুপম নূতন সংস্করণ ছিল যেন এখনকার দিনগুলি। ভগিনী নিবেদিতার কথাই একটু উদ্ধৃত করি —

বৎসরের সে দিনগুলি ছিল বিচিত্র ও মধুময়।

দুর্নিরীক্ষ্য জীবনদর্শনটি যেন বাস্তব হয়ে একেবারে সম্মুখে এসেছিল, মুঠার মধ্যে ধরা দিয়েছিল। দেখেছিলাম, সেই বিরাট ব্যক্তিটিকে যাঁর কৃপায় ধ্রুব বিশ্বাস জাগ্রত হয় অন্তরে, আর অংশত অনুভব করেছিলাম সেই বিশেষ মানসিক অবস্থাটি যার ফলে জীবনের অর্থ প্রকাশিত হয়, নূতন ব্যাখ্যা স্ফূর্তি লাভ করে।

Beautiful have been the days of the year. In this the ideal has become the real···We have learnt something of the mood in which new faiths are born, and of the Persons who inspire such faiths···

তমিস্রাবৃত নিস্তব্ধ পার্বত্য রজনীর দীর্ঘপ্রহরগুলির সে কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

বায়ু-প্রবাহে ও পত্র-মর্মরে নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে একটানা একটি সুর—মহাদেব! মহাদেব! মহাদেব!

সে অনুভূতির কোন মূল্য নিরূপণ কি সম্ভব?

To those who have known such hours, life is richer and sweeter and in the long nights even the wind in the palm trees seems to cry—Mahadeb! Mahadeb! Mahadeb!

তথাপি, এ সকল সত্ত্বেও, কিন্তু একথা সত্য যে, সেই একান্ত ধ্যান-তন্ময়তা ও নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্মুখিনতার মধ্যেও, সেই নিত্য-নূতন উপলব্ধির মধ্যেও—ভারতবর্ষের চিন্তা সতত স্বামীজীকে উন্মনা করে রেখেছিল।…

এই সময় ভারতবর্ষই তাঁর ধ্যান ছিল, তাঁর স্বপ্ন ছিল।

India throbbed in his breast, India beat in his pulses.

ভগিনী নিবেদিতা সেই অবস্থাটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করে ছিলেন। তাঁরই ভাষায়…

India was his day-dream, India was his nrightmare…

He was a born lover, but the queen of his adoration was his mother-land.

এ কালেই, হিমগিরির প্রশান্ত নীরবতার দিনগুলিতেই, একদা ভগ্নী নিবেদিতার সঙ্গে ভাবগত জীবনের এক চরম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল স্বামীজীর। সে বিচিত্র মধুর কাহিনীটিও এখানেই বলছি।

পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্তের দুইটি স্বতন্ত্র সভ্যতার ভিন্নমুখী চিন্তাধারায় যুগোপযোগী সমন্বয়ের জন্য নিবেদিতার সরস চিত্তভূমিটি একটি অতি অনুকূল ক্ষেত্র ছিল। স্বামীজী জানতেন সে রহস্য। সেজন্য যথাকালে নিজ সক্ষম দক্ষিণ হস্তচালনায় সারগর্ভ বীজও সেখানে তিনি বপন করেছিলেন। তারপর ঊর্ধ্বশীর্ষ অঙ্কুরের ক্রম-উদ্গমের দিনগুলিতেই এক বিষম সংঘর্ষ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল —নৈনিতাল-আলমোড়ার ধ্যান-তন্ময়তার অনবদ্য পরিবেশে।

স্বামীজী বলতেন, বর্তমান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বিজ্ঞানে ও শিল্পোৎকর্ষে অদ্ভুত শক্তি দেখিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকের হাহাকারও বাড়িয়েছে, অভাববোধকেও উগ্রতর করে তুলেছে। অন্যদিকে, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথও যেমন প্রদর্শন করছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার ঐহিক অভাববোধকেও বহুলাংশে সংযত করেছে, প্রশমিত করে দিয়েছে। ইদানীন্তন কালে, ঐ দুই সভ্যতার সার্থক সমন্বয়ের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দিব্য জীবনালোকে কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সুন্দর সংমিশ্রন হবে, গভীর আত্মবিশ্বাস ও নিঃশেষ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতা দেবত্ব লাভের প্রয়াসে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে,—বর্তমান যুগের এইটি আন্তরিক কামনা।

আর নিবেদিতার অনন্যসাধারণ জীবনটিতে তারই প্রত্যক্ষ পরীক্ষা তিনি শুরু করেছিলেন। তার প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল অতি দূরপ্রসারী।

নিবেদিতা তদীয় আত্ম-জীবনীতে লিখেছিলেন···একালে আমার আজন্ম-পোষিত সকল ধারণা ও সংস্কারের উপর যে প্রচণ্ড আক্রমণ ও ধিক্কার প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছিল তার তীব্রতাও যেমন কঠিন ছিল, ব্যাপকতাও তেমনি অপ্রত্যাশিত ছিল। আমি যেন এককালে দিশেহারা হয়েছিলাম, বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। ইউরোপের চির-পরিচিত পরিবেশে আচার্যের যে মোহন-মূর্তিটি আমাকে আকর্ষণ,

করেছিল, মুগ্ধ করেছিল—আজ অকস্মাৎ তার স্থানে আর এক প্রখর মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল আমার সম্মুখে, সে মূর্তি যেমনি কঠোর, তেমনি উদাসীন।

আমার অন্তরের অশান্তি ও ক্ষোভ যেন তখন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। চারদিকের সব পথ যেন অবরুদ্ধ। বাতায়ন পথে বায়ু আর প্রবেশ করে না—সমগ্র জীবনটিকে ঘিরে যেন শুধু এক অভেদ্য তমিস্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছিল যেন চারিদিকে কেবলি অন্ধকার আর অন্ধকার। এ কোথায় এসেছি, কেন এসেছি!

এমনি সময় সহসা, এক ঈষৎ চন্দ্রালোকিত উত্তীর্ণ-প্রায়-সন্ধ্যায়, তাঁর সকল সমস্যার সমাধান হয়েছিল—অদ্ভুতভাবে ও বিস্ময়কর এক পরিস্থিতিতে। সেদিন নিবেদিতা একটি মুক্ত বারান্দায় আরও দু' একজন সাক্ষী সহ পূর্বাস্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অকস্মাৎ স্বামীজী পিছন দিক থেকে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং নিবেদিতার মাথায় নিজ দক্ষিণ করতল স্থাপন করে বললেন:

'দেখ, মুসলমান ধর্মমতে চন্দ্র শান্তির প্রতীকরূপে সমাদৃত। অর্ধচন্দ্রশোভিত ইসলামের জাতীয়-পতাকা সেই সমাদরেরই সাক্ষ্য বহন করে।

এস, আমরাও আজ ঐ নূতন চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবনের সূত্রপাত করি।'

ঐ বাক্য আর দক্ষিণ হস্তের সে বিচিত্র কল্যাণ-স্পর্শ—

মুহূর্তে এক মহাবিপ্লব এনে দিল নিবেদিতার মানস-জীবনে, দিব্যশক্তির অমোঘ প্রভাবে সকল সমস্যা যেন নিঃশেষে অপসৃত হল। অন্তরলোক আশা ও আনন্দের জ্যোতিঃধারায় পরিপূর্ণ হল, প্লাবিত হয়ে গেল।

সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন...

'অতীত যুগে একদা আমার গুরুর গুরু, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, এমন দিন আসবে যখন নরেন্দ্র স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চারিত করে দেবে।

আমার অশেষ সৌভাগ্যবশে সেই দিন সেই ভবিষ্যৎ-বাণী আমার জীবনেই মূর্ত হয়েছিল—সেই আলমোড়ার নিস্তব্ধ বাংলোটিতে, অবিস্মরণীয় সেই সান্ধ্য-মুহূর্তটিতে।'

আজ স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কেউ আর ইহজগতে নেই। ভারতের নবযুগের বিচিত্র ইতিহাসে এক বশিষ্ট অধ্যায় যোজনা করে আজ তাঁরা লোকান্তরে।

শুধু পুঁথির পাতার অক্ষয় বন্ধনে বন্দী হয়ে—তাঁদের যে-ঐকান্তিক নিবেদন আমাদের কর্ণে এসে পৌঁছায়, আঘাত করে আমাদের মর্ম-মূলে—তারই বিচিত্র সকরুণ ধ্বনির মধ্যে আজও আমরা যেন শুনতে পাই।...

'Swamiji, how best can we serve you?'
'Love India,...I need no other service.'

* * * *

স্বামীজীর সঙ্গে বরিশালের স্বনামধন্য অশ্বিনীবাবুর এইকালের সাক্ষাৎকারটিও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি এইরূপ...

স্বামীজী তখন আলমোড়ায়। বৃষ্টিধৌত, পরিচ্ছন্ন আলমোড়ার আকাশপটে প্রসন্ন-প্রভাতটি সেদিন বিচিত্র রূপালী ছটায় প্রতিফলিত।

স্বামীজীর আলমোড়া আগমনের সংবাদ পেয়ে মহাত্মা অশ্বিনী-

কুমার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে অশ্বিনীবাবু প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীজীকে,—'সমগ্র পৃথিবী আপনি পরিভ্রমণ করেছেন স্বামীজী। লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তরে অপূর্ব ধর্ম-ভাব সেই সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত করেছেন। কিন্তু আমাদের দুঃখিনী জন্মভূমির মুক্তি কোন্ পথে তা কি আপনি স্থির করতে পেরেছেন?'···

—'নূতন ক'রে আমি কিছুই স্থির করিনি অশ্বিনীবাবু,'—উত্তর করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ,—'তবে বহু চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় এই সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেছি যে—ধর্মই আমাদের জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ড, আমাদের অস্তিত্বের মূল ··the very essence of our being···আমাদের যা-কিছু প্রগতি-প্রয়াস তা ঐ ধর্মের মধ্য দিয়ে, আর সত্যের আশ্রয়েই করতে হবে।

অন্যথা ব্যর্থ হবে পরিশ্রম, পণ্ড হবে প্রচেষ্টা।

—কিন্তু, কংগ্রেসের কর্মপন্থায় কি আপনার কোন আস্থা নেই?—

কিছুমাত্র না,—উত্তর করেছিলেন স্বামীজী। ভারতের প্রাণ-শক্তির আধার-স্বরূপ যে অগণ্য জনসাধারণ—যাকে mass বলা হয়ে থাকে, তাকে জাগ্রত করবার, উন্নত করবার চেষ্টা না করে—কেবল মাত্র কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করলেই কোন কাজ হবে এ আমার বিশ্বাস নয়।

'If the Congress does anything for the masses—it has my sympathy.'

তারও কতকাল পরে, কত বৎসর অন্তে—গণসংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল কংগ্রেস এবং সেই পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েই প্রভূত শক্তিও অর্জন করেছিল সে উত্তরকালে! জাতির আধুনিক কালের দ্রুত-পরিবর্তনশীল ইতিহাসে সে-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

ধর্ম' বলতে কোন বিশেষ মতবাদকে তিনি বোঝাতে চান কিনা—এ প্রশ্নও অশ্বিনীবাবু সেই সময় স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

উত্তরে বলেছিলেন স্বামীজী,—

সকল মতবাদের অপরিসর গণ্ডী অতিক্রম করে…সকল ধর্মের আনুষ্ঠানিক সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করে…এক উদার, সার্বভৌম, যুক্তিসহ, ও সর্বমত-সমঞ্জসা মানবধর্ম নিজ জীবনালোকে প্রতিষ্ঠা করতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন এ-যুগে, আর আমি সেই কথাটিই পৃথিবীর বুকে প্রচার করতে ও প্রতিষ্ঠা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেলাম।

আমার মতে—ধর্ম অর্থই শক্তি।

The religion that does not infuse strength into the heart is no religion to me—be it of the Upanishads, the Gita, or the Bhagabatam. Strength is religion and nothing is greater than strength···

To be as deep as the Ocean and as broad as the Sky.

এই আমার ধর্ম।

বিগত অতীতে যত মহান সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর বুকে আমি তাদের গ্রহণ করেছি। বর্তমান কালে নবজাত ও সজীব যে সব চিন্তারাশী, তাদের সঙ্গেও আমার নিজের চিন্তাপ্রবাহকে আমি সতত যুক্ত রেখে চলেছি। আবার অনাগত ভাবীকালে উত্তর-যুগের সাধকগণ সত্যের যে নব নব রূপ আবিষ্কার করবেন আমার অন্তরের বাতায়ন তাদেরও জন্য চিরদিন উন্মুক্ত থাকবে।···

* * * *

এ-কালের আরও দু'তিনটি ঘটনা—ক্ষুদ্র হলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে এখানেই আমরা উল্লেখ করব,—

প্রথম ঘটনাটি,— তাঁর অতি বিশ্বস্ত সাঙ্কেতিক লেখক গুড্-উইন যাকে তিনি সস্নেহে 'মাই ফেইৎফুল গুড্-উইন্' বলে উল্লে করতেন—তাঁর আকস্মিক পরলোক গমন।

সে-মৃত্যু স্বামীজীকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা, তদীয় অতি বিখ্যাত মৃত্যুরূপা কালী, Kali th Mother...শীর্ষক কবিতা রচনা। তাঁর এই কালের বিচিত্র চিন্তা ধারার একটি বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে এই কবিতাটি অমরত্ব লা করেছে।

অনূদিত আকারে কবিতাটি এই বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছিল—

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণা-বায়ুবেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ, বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্থল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তাঁর মৃত্যুব কালিমা মাখা গায়।
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে, মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

*　　　*　　　*

তৃতীয় ঘটনা—তাঁর অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর গুহামন্দির দর্শন

সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের ত্রিশে তারিখ একেবারে নিঃসঙ্গ, কৌপীন-সম্বল স্বামীজী ক্ষীরভবানীর দুর্গম গুহামন্দির দর্শনে যাত্রা করেছিলেন এবং প্রায় সপ্তাহকাল নির্জনবাসের পর প্রত্যাবর্তন করেছিলেন শিষ্যবর্গের মধ্যে।

কিন্তু ক্ষীরভবানীর মন্দিরের একান্ত অপ্রত্যাশিত অথচ অতি স্পষ্ট এক দৈববাণী—তাঁর অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিশেষ ভাবান্তর আনয়ন করেছিল।

শিক্ষাদাতা ও আচার্য বিবেকানন্দের প্রচ্ছন্নতার অন্তরালে অখণ্ডের ঘরের জ্যোতিঃঘনতনু যে দেবশিশু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে এতদিন ছিল আত্মগোপন ক'রে—আজ অকস্মাৎ সেই দৈববাণীর প্রভাবে সে যেন চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

বহুদিন-বিস্মৃত তাঁর অতি-প্রিয় সেই সুর-তরঙ্গটি অন্তরের অন্তঃস্থলে চকিতে যেন পুনঃ জাগ্রত হয়েছিল এক অপরূপ করুণ মূর্ছনায়···

মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে ?···

ক্ষীরভবানীর মন্দির থেকে ফিরে এসেই তাই তিনি বলেছিলেন, কর্মী বিবেকানন্দ, নেতা বিবেকানন্দ, গুরু বিবেকানন্দ চলে গেছে—আর ফিরছে না!

মহামায়ার জয় হোক, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমি তাঁর দাস মাত্র,···তাঁর চরণাশ্রিত সন্তান মাত্র।—

আরও একটি বিচিত্র ঘটনা এই কালেই সংঘটিত হয়েছিল। স্বামীজীর মনোভূমিতে তার প্রতিক্রিয়াও বড় কম হয়েছিল না।

এক সিদ্ধবাক্ মুসলমান ফকির এই সময় স্বামীজীকে অভিসম্পাত করেছিল। বলেছিল, 'তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

ফকিরের এক প্রিয়শিষ্য স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঘন ঘন তাঁর কাছে যাতায়াত করত, নিষেধ শুনতো না। সেই জন্যই ঈর্ষাকাতর হয়ে ফকির স্বামীজীর প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে অভিশাপ স্বামীজীর জীবনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। সত্য সত্যই একদিন স্বামীজীর কণ্ঠদেশ থেকে খানিকটা রক্ত বের হয়েছিল।

এ ঘটনায় স্বামীজীর মনে তীব্র ক্ষোভের উদয় হয়। কঠিন ধিক্কার আসে। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে সেজন্য একদিন শ্রীমার কাছে অভিযোগ করে তিনি বলেছিলেন—'এইত মা, ঠাকুরের প্রভাব! একটা বাজে লোক অভিশাপ দিয়ে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বার করে দিল। আর ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।'

মা অবশ্য মৃদুহাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন,—'তাতে আর কি হয়েছে বাবা! ওটিও তো একটি বিদ্যা। ঠাকুরের মুখ দিয়েও ত রক্ত উঠেছিল হলধারীর অভিশাপে।

শুনেছি, আচর্য শঙ্করের দেহেও নাকি এইভাবে ভগন্দর রোগ প্রবেশ করেছিল।'

স্বামীজী অবশ্য আর কোন কথা বলেননি তার উত্তরে।

* * * *

এমনি করে, হিমালয়ের প্রশান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে—শ্রীনগর, আলমোড়া, নৈনিতাল প্রভৃতির শব্দহীন ধ্যানপরায়ণতায়—পাশ্চাত্ত্য কর্মীদের শিক্ষাদান ব্যপদেশে—প্রায় ছয়মাস কাল এক অনুপম জীবন যাপন ক'রে—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষ দিকে ফিরেছিলেন স্বামীজী কলিকাতায়। আর সেই সময় থেকে সন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস অবধি—সঙ্ঘের নিজস্ব বাটীতে, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠেই তিনি অবস্থান করেছিলেন।

তদীয় জীবনচরিতকার এই কালের অধ্যায়টিকে—Swamiji with his own people, 'আপনজন সহবাসে স্বামীজী'—বলে অভিহিত করেছেন।...

সঙ্ঘের কার্যাবলী তখন আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ঢাকা, কাশী প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বা হয়েছে, ইংরেজী ও বাংলায় তিনটি মাসিক পত্রিকা...উদ্বোধন, প্রবুদ্ধ-ভারত, বেদান্তকেশরী...বেদান্তের উদার মতবাদ প্রচারোদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

সুতরাং, অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে, বহুলাংশে তরুণ ব্রহ্মচারীদের শিক্ষাদানের কাজ হাতে নিয়ে—প্রিয় গুরুভাইদের সাহচর্যে, with his own people—সম্পূর্ণ আপন ভাবে ভদ্রতা-অভদ্রতার সকল আদব-কায়দা বর্জন করে—যাকে ইন্‌ফরম্যাল বলে, সেইভাবে কতকগুলি দিন যাপন করবার সুযোগ এই সময় স্বামীজী পেয়েছিলেন বহুকাল পরে।

বস্তুত, বাহ্যিক আচার নিয়ম যা তিনি কোনদিন পছন্দ করতেন না—অথচ পাশ্চাত্ত্যের কর্মক্ষেত্রে, কতকাংশে হলেও, মেনে চলতে বাধ্য হতেন—সেগুলির পীড়াদায়ক বেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ-শোভিত বিশ্বধর্ম-মহামন্দিরের পাদপীঠে—অব্যাহত নিশ্চিন্ততার ও একান্ত অনাসক্তির মধ্যে কেটেছিল তাঁর এই সময়ের দিনগু'ল।

তাঁর জীবনাখ্যায়িকায়, স্বামী-শিষ্য-সংবাদ নামক গ্রন্থে এ জীবনের অতি মনোরম পরিচয় বিপিবদ্ধ আছে।

ইতিমধ্যে আবার, ইংলণ্ড-আমেরিকার কর্মক্ষেত্রও বহুলাংশে প্রসারিত হয়েছে। নূতন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। উৎসুক এবং জিজ্ঞাসু নরনারী দিনে দিনে বর্ধিত-সংখ্যায় সমবেত হচ্ছে বেদান্তের বার্তা শুনবার জন্য, বেদান্ত-মতবাদ গ্রহণ করবার জন্য।

সুতরাং এই কালে. আর একবার ওদেশে যাবার জন্য—পুনঃপুনঃ তত্রত্য কর্মী, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গ বিশেষ আহ্বান জানাতে লাগলেন স্বামীজীকে।…

স্বামীজীর শরীর তখন দীর্ঘকালের পরিশ্রমে ভগ্নপ্রায়. সমুদ্র যাত্রায় স্বাস্থ্যেরও কিছু উন্নতি হতে পারে, চিকিৎসকগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

ফলে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন—গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মানসকন্যা নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার স্বামীজী যাত্রা করলেন ইউরোপ-আমেরিকার উদ্দেশ্যে। কাজেই. মোটের উপর, প্রায় আড়াই বৎসরকাল এই সময় তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান করেছিলেন —১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ থেকে ১৮৯৯খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ অবধি, এবং সেই আড়াই বৎসরেরই অতি সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ এ পর্যায়ে আমরা বিবৃত করতে চেষ্টা করলাম। এর যথার্থ তাৎপর্য, জাতির নবজাগরণের ইতিহাসে এর সত্যিকার মূল্য এবং গুরুত্ব আজও সঠিক নির্ণীত হয়নি। ভাবীকালের ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও সায়েন্টিফিক্ মন নিয়ে যথাসময়ে তা নিরূপণ করবেন এই আমাদের বিশ্বাস।…

আমরা পর্যায় শেষে শুধু এইটুকু বলি যে, আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের চলার পথে যে অর্ধশতাব্দীরও অধিক কালকে আমরা সবেমাত্র পিছনে ফেলে এসেছি—সেকালের রাজনীতি, সমাজনীতি. শিক্ষা, সাহিত্য শিল্প, জন-জাগরণ—প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে আমরা যতটা অগ্রসর হয়েছি, যা কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছি তার প্রেরণা ও নির্দেশ—এই ক্ষণজন্মা মনীষীর মহৎজীবনের মহত্তর সাধনা থেকে —প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ—আমরা আহরণ করেছিলাম এই আড়াই বৎসরের মহামূল্যবান কালটিতে। নূতন সূর্যের স্বর্ণরশ্মি মহাব্যোমপথে সহস্রধারায় যাতে আমাদের মলিন ও অস্বচ্ছ গৃহগুলিতে প্রবেশ

করতে পারে—তার জন্য বিভিন্ন দিকের রুদ্ধ বাতায়নগুলি উন্মুক্ত করেছিলাম এই কালেই।

উৎসুক ও জিজ্ঞাসুমন, নূতনযুগের পাঠক—অনুসন্ধানে সে তত্ত্বকে অধিগত করুক, উপলব্ধি করুক—এই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি।

*   *   *   *

অগণ্য মণিখণ্ডে-গ্রথিত বিবেকানন্দ-বাণীর মাল্যখানি স্বল্পায়তন নয়। তা থেকে চয়ন ক'রে - দু'টি চারটি রত্নগুটিকা আহরণ করাও সহজসাধ্য নয়। কিন্তু তাঁর অক্ষয়, অশরীরী-বাণী সতত ব্যোমপথে সঞ্চরমান। অদৃশ্য লিপিতে আকাশগাত্রে সে বাণী অনন্ত কালের জন্য খোদিত।

উৎসুক দৃষ্টি মেলে যদি তাকিয়ে দেখি, তবে দেখতে পাব···

আকাশে-বাতাসে আজও দীপ্যমান অনির্বাণ তাঁর বহ্নিবাণীর লোহিত লিখা।

অবহিত হয়ে যদি শ্রবণ করি, তবে শুনতে পাব···

প্রাণশক্তিতে ভরপুর তাঁর বেদমন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনি।

অর্ধশতাব্দী পর্বে একদা যেমনটি ঝঙ্কৃত হয়েছিল, আজও তারা তেমনি ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

'মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না, গতরাত্রি পুনর্বার আসে না··· বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না। জীবও দুইবার একদেহ ধারণ করে না। অতএব, অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজায় আহ্বান করিতেছি, গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি—বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।'

'আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলা-সহায়ক···এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।'··· মহা হুঙ্কারে কাজ কর।

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ।

কেন বন্ধু করিছ ক্রন্দন? তোমাতেই সর্বশক্তি নিহিত। হে দেবতা, তোমার ঐশ্বর্যময় রূপটি প্রকাশ কর। এই ত্রিভুবন তোমার পাদমূলে। জড়ের কোন ক্ষমতা নেই, আত্মার শক্তিই প্রবল, আত্মার শক্তিই অপ্রতিরোধ্য।

——)*(——

****
* চার *
****

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পশ্চাত্যদেশে যাত্রা—ইউরোপের পথে আমেরিকায়। এবারকার জাহাজ 'গোলকুণ্ডা,' প্রথমবার ছিল 'পেনিন্‌সুলার।'

খিদিরপুর ডক্‌ থেকে নোঙ্গর তুলে, গঙ্গার বুক চিরে, বঙ্গোপ-সাগর অতিক্রম করে,—মাদ্রাজ ও সিংহল স্পর্শ করে,—দূর ইউরোপের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছিল 'গোলকুণ্ডা'।

সন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বন্দর থেকে অখ্যাত, অপরিচিত ও একক সন্ন্যাসীর সেই প্রথম পাশ্চাত্যযাত্রার দিনটির সঙ্গে আজকের বিশ্ববিশ্রুত, আচার্য বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার সে দেশে যাত্রার কতই না প্রভেদ, কতই না স্বাতন্ত্র্য।

সেদিন জীবনের বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপনের তীব্র উৎকণ্ঠায় তপ্ত-শোণিত প্রবাহমান ছিল ধমনীতে। অনির্দিষ্ট পথের দুর্নিরীক্ষ্য দূরপ্রান্ত থেকে রহস্যময় ভবিষ্যতের আহ্বান ছিল অস্পষ্ট অথচ অনুপেক্ষণীয়।

আর আজ?

আজ জীবনের কর্ম পরিসমাপ্ত প্রায়, যুগব্রত বহুলাংশে উদ্‌যাপিত।

আজ তাই সাক্ষীরূপে, অনাসক্ত দ্রষ্টারূপে—শান্ত সমাহিত মনে ভেসে চলেছেন স্বামীজী—

'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'।

*　　*　　*　　*

জুন মাসের ২০শে তারিখ খিদিরপুর ডক্ ছেড়ে—জুলাই মাসের ৩১শে তারিখ ইংলণ্ডে পৌঁছেছিল জাহাজ।—

সুতরাং, মোটের উপর একমাসেরও কিছু বেশী কাল—এ যাত্রায় সমুদ্রের বুকে কেটেছিল তাঁর। বিচিত্র চিন্তা ও বিচিত্র অভিব্যক্তির অপূর্ব সম্পদ-সমৃদ্ধ -স্নিগ্ধ, মধুর ও আনন্দোজ্জ্বল ছিল সে দুর্লভ দিনগুলি।

স্বামীজীর নিজের হাতেব লেখা—রোজ্‌নাম্‌চা ঢঙের পুস্তিকা 'পরিব্রাজক', আর ভগিনী নিবেদিতার সুবিখ্যাত—The Master as I saw Him—গ্রন্থে এ দিনগুলির বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। এই 'পরিব্রাজক' গ্রন্থেই হৃষিকেশের গঙ্গার অপূর্ব-মধুর বিবরণ রয়েছে— অনবদ্য ভাষায়।

'হৃষিকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার দশহাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব, সুস্বাদ, হিম-শীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারী', আর সেই অদ্ভুত হর্ হর্ হর্ তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের হর হর প্রতিধ্বনি। সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র, দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণ-প্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ! সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গঙ্গাবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ!'...

এই 'পরিব্রাজকের' পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গেই স্বামী সারদানন্দ লিখেছিলেন—'তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্য বিহীন নহে। কিসে ভারতের বর্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে—এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপের মূলে। আবার ভারতের দুর্দশা কোথা হইতে আসিল, কোন্ শক্তিবলে

উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা সে সুপ্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং তাহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি,—এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষান্ত দেখিবে, তাহা নহে ; কিন্তু বদ্ধপরিকর যতি—স্বদেশে-বিদেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয় সকলের সত্যতাও যে যথাসম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহারও নিদর্শন পাইবে।'—কিন্তু সে বিষয়ে যথা সময়ে আমরা আলোচনা করব।

এদিকে, নিঃসীম সমুদ্রের অশান্ত বুকের উপর দিয়ে, সুয়েজ-খালের মধ্য দিয়ে—লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছিল জাহাজ।

প্রাচীন যুগের বহুবিচিত্র সভ্যতার কেন্দ্রস্থলসমূহের পার্শ্ব দিয়ে অগ্রসর হতে হতে—সে-সব বহুদিন বিস্মৃত অতীতযুগের রহস্যময় গর্ভ-গৃহে এ সময় ডুব দিয়েছিলেন যেন স্বামীজী।

সেই পিরামিডের দেশ,—সেই হিক্‌স বংশ, ফ্যারাও বংশ, টলেমি বংশের প্রাচীন ভূমি···

সেই আরবদের দুস্তর দিগ্বলয়-লীন মরু-প্রান্তর।

অদ্ভুত-দৃষ্টি, অদ্ভুত-চলন—অনবরুদ্ধ স্বাধীন হওয়ার উদ্ধত আরব, আর তাদের উত্তপ্ত মরুবালুকার কঠিন শুষ্ক দেশ।

আরও এগিয়ে,···প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংযোগ-পথ সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর।

যে ভূমধ্যসাগরের তটভূমে নানাবর্ণের নানাজাতির মহাসংমিশ্রণ ঘটেছে যুগে যুগে, শতাব্দীতে শতাব্দীতে···

মিশরে, এশিয়া-মাইনরে, গ্রীসদেশে—ফিনিশিয়, ফিলিষ্টিন, ইহুদী, বাবিল, আসীরিয়, ইরাণী—যে-সকল সভ্যতা কালের বুকে চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে বিলীন হয়ে গেছে, প্রাচীনা পৃথিবীর প্রাচীন কাহিনীর সে-সব দেশ ?

স্বামীজী বলেছিলেন,—'গল্প নয়, সত্য ; সে-সকল প্রাচীন দেশ কালসাগরে প্রায় বিলীন হয়েছিল। যা-কিছু লোকে জানত,—তা প্রায় প্রাচীন যবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবেল নামক য়াহুদি পুরাণের অত্যদ্ভুত বর্ণনা মাত্র।

এখন পুরানো পাথর, বাড়ীঘর, টালিতে লেখা পুঁথি···আর ভাষা-বিশ্লেষ শতমুখে গল্প কোরচে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই কত আশ্চর্য কথা বেরিয়েছে, পরে আরও কি বেরুবে কে জানে ?'···

সেই-সব অতি পুরাতন কালের দেশগুলির 'বনরাজিনীলা'—প্রান্ত দিয়ে এ গয়েছিল জাহাজ—আর সঙ্গে সঙ্গে মৌন, স্তব্ধ অতীত যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, মুখর হয়ে উঠেছিল স্বামীজীর কাছে। মাটির বুকে সুপ্ত যে-সব চমকপ্রদ কাহিনী, করুণ গাথা তারা যেন কথা বলতে শুরু করেছিল তাঁর কর্ণমূলে।

জীবধাত্রী পৃথিবীর বুকে কত বিচিত্র বর্ণের, কত বিচিত্র দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের—কত অসংখ্য মানবগোষ্ঠীর আনাগোনা ঘটেছে যুগে যুগে, মহাকালের অন্তহীন বেলাভূমে শতাব্দীতে শতাব্দীতে অঙ্কিত ও বিলুপ্ত হয়েছে কত সংখ্যাহীন তাদের চরণচিহ্ন।···

আজ তাদেরই সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণে, গূঢ় নিহিতার্থের অবিশ্রাম উদ্ঘাটনে একান্ত তৎপর হয়েছিল স্বামীজীর মন এবং তাদেরই মধ্য দিয়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত জীবনের আরও একটি দিক যেন প্রকটিত হয়েছিল—এই জাহাজযাত্রার দিনগুলিতে।

আবার শুধু অতীত দিনের বিলুপ্ত কাহিনীর রহস্যচ্ছায়ার মধ্যেই নয়, দূর দূর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যতের কুক্ষিমধ্যেও তাঁর অলোক-দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল এই কালে। বিশেষ করে ··সর্বভাবে নিঃস্ব যারা, সর্বদিকে উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত যারা, বর্ণাধিকারে চিরপদানত যারা— যাদের দুঃখ ও বেদনা চির দুর্বিসহ ছিল স্বামীজীর কাছে—সেই তথাকথিত 'ছোটজাত'দের ভাবীকালের চিত্রও যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে। আর তাঁর অননুকরণীয়, অগ্নিগর্ভ ভাষায় সে-সব তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

প্রত্যক্ষদ্রষ্টার সে দ্বিধাহীন, সংশয়হীন, নির্ঘাত উক্তি আজ বাস্তবে রূপায়িত। –

মানব-সভ্যতার প্রগতি পথে—ব্রাহ্মণ, ·ক্ষত্রিয় প্রমুখ চতুর্বর্ণের অধিকার পর্যায়ক্রমে চলে এসেছে। ব্রাহ্মণ্য যুগ অতীত হয়েছে, অতীত হয়েছে ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের যুগ।··· বৈশ্য-প্রাধান্যে নিয়মিত আজিকার পৃথিবী বণিক শক্তির কুক্ষিগত।

কিন্তু এরও পরিবর্তন আসন্ন। ধীরে ধীরে প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মেই আসছে, আসছে সেই মহাবিবর্তন।···

জাগবে, শূদ্রশক্তি জাগবে, গণশক্তি জাগবে। সেই বিপুল জাগরণ-যুগ অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে, অনিবার্য গতিতে আসছে। আকাশে কান পেতে সুস্পষ্ট তার পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।···

* * * *

এখন থেকে কতকাল পূর্বেকার এই আখ্যায়িকা। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের কথা এসব। তখনো আধুনিক সাম্যবাদের জন্মকথা মানবের দূর-কল্পনায় নীহারিকাপুঞ্জের মত অস্পষ্ট ও ক্ষীণ।

বল্‌শেভিজম, কম্যুনিজম্ প্রভৃতি আধুনিক রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মতবাদ তখনো ভবিষ্যতের কুক্ষিমধ্যেই নিথর হয়ে ঘুমিয়ে আছে অথবা অস্ফুট-প্রেরণায় জাগতে চাইছে।

সেই তখনকার প্রতীক্ষারত অস্পষ্টতার জগতে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করেছিলেন স্বামীজী এসব অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। ইতিহাসের কী সুগভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণী সূক্ষ্মদৃষ্টি যে তাঁর ছিল এ-জাতীয় বহু উক্তি থেকে তারই ঈষন্মাত্র পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়ে থাকি।

আবার, এসব উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কোটি কোটি নর-নারীর জন্য হৃদয়-রক্তে-সিঞ্চিত সুগভীর সমবেদনার কথা, আশা-উৎসাহের শক্তিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীও এইকালে উদ্গীত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে।...

'হায়! উচ্চবর্ণের পূর্বপুরুষগণ দু'খানা দর্শন লিখেছেন বলে দশখানা কাব্য লিখেছেন বলে— তাদের ডাকের চোটে গগন ফাটে। আর যাদের রুধিরস্রাবে, মনুষ্যজাতির যা-কিছু উন্নতি—তাদের কথা কে বলে, কে ভাবে? কিন্তু অলঙ্ঘ্য কালের বিধান, চক্রাকারে নিয়ত বিঘূর্ণিত মহাকালের রথের চাকা।

বিলুপ্ত হবে, নিঃশেষে, নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলুপ্ত হবে উচ্চবর্ণের জবর দস্তির বিশেষ অধিকার। নাম-মাত্র-অবশেষ আভিজাত্য ও কাঞ্চন-কৌলিন্যের দীর্ঘকালের অত্যাচারের কলঙ্কলেখা অপসৃত হবে পৃথিবীর বুক থেকে।'...

'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে উপলক্ষ্য করে ভারতের শ্রম-জীবিদের উদ্দেশ্যে 'পরিব্রাজকে'র পৃষ্ঠায় লিখিত তাঁর সেই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী আজ শুধু ভারতের নয়, বিংশ শতাব্দীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিধ্বনিত,—দেশকালোপযোগী ভাবে বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তৃত-পরিধিতে ক্রিয়াশীল।

এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা—তোমরা, ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূতকাল লুঙ্, লঙ লিট্ সব একসঙ্গে।...ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য—তোমরা ইৎ, লোপ, লুপ্।...ভূতভারত-শরীরের-রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা। ধূলিতে

পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশিয়ে যাও—শূন্যে বিলীন হও।…আবার নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে, মালা, মুচি—মেথরের ঝুপ্ড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে ··বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে।

এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা।…

এত শান্তি এত প্রীতি, এত ভালবাসা—এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!

অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।…

তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে যাও—অদৃশ্য হয়ে যাও।

কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ গুরু কি ফতে'।

শুধু এই নয়,—সঙ্গে সঙ্গে আরও কত পৌরাণিক কাহিনী—বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব, প্রসার ও অবদানের কত মৌলিক, অনবদ্য বিশ্লেষণ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের কত ব্যাপক ও বিচিত্র তুলনামূলক সমালোচনা—একালের সমুদ্র-যাত্রাকে যে অমূল্য করেছিল সহযাত্রীদের কাছে তা বলবার নয়।

কখনো কখনো আবার,—ভারতবর্ষের যে সব বিরাট অধ্যাত্ম-পুরুষের সংস্পর্শে যাবার সুযোগ তাঁর নিজ জীবনে ঘটেছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ, পওহারীবাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রঘুনাথদাস প্রভৃতির দিব্য-জীবন এবং পুণ্যকাহিনীও ধ্যান-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে তিনি প্রকাশ করতেন।

অন্য সকলের জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে। পওহারীবাবার একটি ক্ষুদ্র জীবনী তিনি নিজেই রচনা করেছিলেন উত্তরকালে। কিন্তু সাধারণে অজ্ঞাতপ্রায় রঘুনাথের জীবনকাহিনীটি এ-সময়ই তিনি বিবৃত করেছিলেন।

পওহারীবাবার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ এবং সংযোগ ঘটেছিল পরিব্রাজক জীবনের মধ্যপর্যায়ে, গাজীপুরে, সন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে। সে কথা পূর্বে বলেছি।

রঘুনাথ দাসকে দেখেননি স্বামীজী।

তাঁর দেহত্যাগের দুইমাস অন্তে—ঘুরতে ঘুরতে, পরিব্রাজকরূপে তিনি রঘুনাথের আশ্রমে গমন করেছিলেন এবং শুনেছিলেন তাঁর বিচিত্র জীবনাখ্যায়িকা—

* * * *

পল্টনের সামান্য বেতনভুক্ সেপাই ছিল রঘুনাথ। মিষ্টভাষী ও নম্রস্বভাব বলে সকলের প্রিয় ছিল সে। সত্যবাদী ও কর্মনিষ্ঠ বলে বিশ্বাসভাজন ছিল উর্ধ্বতন কর্মচারীদের। দিন তার কাটছিল সহজ ভাবে, সাধারণ ভাবে, যেমন আর সবারই দিন কাটে।

কিন্তু এক আকস্মিক, অলৌকিক ঘটনায়—সহসা তার জীবনে আমূল বিপ্লব ঘটে গেল।

সেদিন গভীর নিশুতি রাত্রে নিদ্রামগ্ন সেনা-শিবির। প্রহরীর কার্যে নিরত রঘুনাথ আপন মনে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল এমনি সময় সংঘটিত হয় সে ঘটনা।

সহসা সে শুনতে পেল রামনাম কীর্তনের সুমধুর ধ্বনি দূর গ্রাম-প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে। নিস্তব্ধ রজনীর পরিচ্ছন্ন আকাশে সে সঙ্গীতস্বর কোন্ মাদকতা সৃষ্টি করেছিল, কি দুর্নিবার আকর্ষণ বহন করে এনেছিল কে জানে? কিন্তু সে সুরতরঙ্গ কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে চকিতে উন্মনা করেছিল রঘুনাথকে।—অলক্ষ্য

আকর্ষণে মুহূর্তে রঘুনাথ বিস্মৃত হয়েছিল স্থান-কাল, বিস্মৃত হয়েছিল নিজের অবস্থা ও কর্তব্যের গুরু-দায়িত্ব।

নিমেষে হাতের অস্ত্র ও পরিধানের সামরিক বস্ত্র ত্যাগ করে— সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে বেরিয়ে গেল রঘুনাথ।

একদিন নয়, দু'দিন নয়। সেদিন থেকে শুরু করে কয়েকদিন প্রতি রাত্রেই ঘটতে লাগল এ-ঘটনা। ক্রমে কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হল সে সংবাদ। রঘুনাথের কৈফিয়ৎ তলব করা হল। রঘুনাথ কোন কথা গোপন না করে—অকপটে পূর্বাপর ব্যক্ত করল কাহিনী। প্রার্থনা কবল কর্তব্যচ্যুতির দণ্ড। কর্নেল সতর্ক করে দিলেন তাকে, এ অপরাধের সামরিক শাস্তি চরমদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এই প্রথমবার বলে মার্জনা করা হল তাকে, ভবিষ্যতের জন্য যেন রঘুনাথ সতর্ক হয়।

রঘুনাথ লজ্জিত হয়ে ফিরে এল, ধিক্কৃত হয়ে ফিরে এল। কিন্তু অলঙ্ঘ্য নিয়তির বিধান। সে রাত্রেও রামনাম কীর্তনের প্রাণোন্মাদকারী জয়ধ্বনি শুনতে পেল রঘুনাথ

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
পতিত পাবন সীতারাম।

* * *

আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্।
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।

নিজেকে সংযত করবার, কর্তব্যে অটল রাখবার—যথাসাধ্য চেষ্টা করল রঘুনাথ। কিন্তু অদম্য সংস্কার-প্রেরণায় মুহূর্তে পুনঃ বিস্মৃত হল জগৎ, বিস্মৃত হল পূর্বাপর—অস্ত্র-বস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে সে ছুটে বেরিয়ে

গেল। আর সমস্ত রজনী কীর্তনে অতিবাহিত করে প্রত্যূষে ফিরে এল শিবিরে।

এদিকে কর্নেল স্বয়ং সেদিন বেরিয়েছেন শিবির পরিদর্শনে—গোপনে, কেউকে কিছু না জানিয়ে। রঘুনাথের কর্তব্যপরায়ণতার উপর তাঁর অটুট বিশ্বাস—সেইজন্য রঘুনাথের স্বকীয় উক্তিতেও যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি তিনি। নিজে যাচাই করে দেখবার জন্য—সেদিন গভীর রাত্রে তিনি বেরিয়েছেন।

রঘুনাথের প্রহরাস্থানে গিয়ে দেখলেন রঘুনাথ যথারীতি কর্তব্যে নিযুক্ত আছে। পরপর তিনবার ডাকলেন তাকে—তিনবারই সে জবাব দিল নিজ কর্তব্যস্থান থেকে, নিজ 'পোস্ট' থেকে।

পরদিন কীর্তন-প্রত্যাগত রঘুনাথ বিশেষভাবে চিন্তা করল নিজের অবস্থা। তারপর কর্তব্য স্থির করে, নিজে উপযাচক হয়ে সব কথা নিবেদন করল কর্নেলের কাছে, অব্যাহতি চাইল কর্ম থেকে।...

রাম-নাম ধ্বনি কানে এলেই কেমন আত্মহারা হয়ে যায় সে, নিজের উপর কোন সংযম রাখতে পারে না। চাকুরী করা কাজেই তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। চাকুরী সে আর করবেনা। তাকে অব্যাহতি দেওয়া হোক—এই তার প্রার্থনা।

কর্ণেল বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ রঘুনাথের দিকে—তারপর গভীর বিস্ময়ের সঙ্গেই বললেন,—তিনি স্বয়ং তাকে যথাস্থানে কর্তব্য-নিরত দেখেছেন রাত্রিকালে, তার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনবার। তথাপি রঘুনাথ একটা মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করে কেন নিজের সর্বনাশ সাধন করতে উদ্যত হয়েছে? কী তার উদ্দেশ্য? চাকুরী তো ইচ্ছা করলে এমনিই সে ছেড়ে দিতে পারে।

স্তম্ভিত, বজ্রাহত রঘুনাথ,—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কর্নেলের দিকে।

এ কী শ্রবণ করছে সে! এ কী বিবৃতি! সত্যই কি তবে ঘটেছে এ ঘটনা? অসম্ভব কি তবে সত্যই সম্ভব হয়েছে—মাটি কাঠ, পাথরের এই মরজগতে—নিশীথিনীর নিভৃত নিরালায়?

রঘুনাথের বুকের মধ্যে তখন উদ্বেলিত নটরাজের প্রলয় নাচন। হায় প্রভু!—ভক্তিবিগলিত অন্তরে ভাবছে রঘুনাথ,—ভকত-শরণ, হে মহান! এ দীন সেবকের জন্য হীন প্রহরীর কাজ সত্যই গ্রহণ করেছ তুমি!

মুহূর্তে সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল, ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেল। কর্মত্যাগ করে বৈরাগী হল রঘুনাথ। সরস্বতীর তীরে—বিভোর ধ্যানে, রামনাম তন্ময়তায় কেটে গেল তার দিন।...

এমনি কত মনোহর গল্প ও কাহিনী, কত গভীর আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের স্ফুরণ, অতীতে ও অনাগতে কত অবিশ্রাম যাওয়া-আসা—জলপথের সেই প্রায় একমাস-ব্যাপী সময়কে যে মধুর করেছিল, চিরস্মরণীয় করেছিল ভাবীকালের নরনারীর কাছে—তা পুঁথির পাতায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ভগিনী নিবেদিতা তাই বলেছিলেন,- যাত্রার আরম্ভ-মুহূর্ত থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তার স্রোত ও গল্পের স্রোত চলেছিল অবিশ্রাম গতিতে।

কখন কোন্ মুহূর্তটিতে অন্তরের সুগভীর উপলব্ধি বাক্যে প্রকাশিত হবে—তা পূর্বে অনুমান করা যেত না।

From the beginning of the voyage to the end, the flow of thought and story went on.

One never knew what moment would see the flash of intuition and hear the ringing utterance of some fresh truth—

বস্তুত, নূতন তত্ত্বের ঝঙ্কারে এবং সত্যের নব নব ব্যাখ্যায় অতি অপূর্ব ও অবিস্মরণীয় হয়েছিল 'গোলকুণ্ডার' দিনগুলি।

তারপর ৩১শে জুলাই জাহাজ ভিড়ল লণ্ডনের টিল্‌বারী ডকে। লণ্ডনে তৃতীয়বার পদার্পণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু তিন বৎসর পূর্বে, একদা যে দৃপ্তমূর্তিতে লণ্ডনে পা দিয়েছিলেন তিনি, যে 'সাইক্লোনিক হিন্দু'র যোদ্ধৃরূপ সেদিন দেখেছিল ইংলণ্ড, যে অ্যাগ্রেসিভ্ হিন্দুইজমের জীবন্ত বিগ্রহরূপে প্রকট হয়েছিলেন বিবেকানন্দ সেকালে,—

আজ তিন বৎসর পরে, সে মূর্তি বহুলাংশে সংহত করে প্রশান্ত, করুণাঘন মূর্তিতে স্বামীজী পদার্পণ করলেন লণ্ডনে। নিজের চতুর্দিকে অফুরন্ত প্রেম, স্নেহ ও করুণার অমৃতধারা স্বতঃ বর্ষণ করে আনন্দময় স্বামীজী আজ পিতারূপে, গুরুরূপে প্রতিভাত।...

ছুটির সময় বলে—কর্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর লণ্ডনও তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত ও জনবিরল ছিল। কাজেই লণ্ডনে কোন বক্তৃতা দিলেন না স্বামীজী এবার, কোন বৃহৎ ক্লাসও নিলেন না। বরং অতি অল্প কয়েকদিন মাত্রই লণ্ডনে অবস্থান করে আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্র পথে যাত্রা করলেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে।...

সুনীল জলধির বিস্তৃতবক্ষে আবার কাটল দশ-এগার দিন। পূর্বেরই মত সুগভীর চিন্তাপ্রবাহে সমৃদ্ধ, পরম শিক্ষাপ্রদ, নিত্যনূতন কাহিনীর বিবৃতিতে মধুর ও অক্ষয়।...

'চির-অবিস্মরণীয় সেই দশটি দিন আমাদের কেটেছিল সমুদ্রের বুকে। মনে হয়েছিল, বড়ই তাড়াতাড়ি যেন আমরা নিউইয়র্ক পৌঁছে গেলাম। মনে হয়েছিল, মহান গুরুর অতি নিকট-সান্নিধ্যে বাস করবার সেই সুদুর্লভ সুযোগের জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও বুঝি আমাদের নেই।'—মন্তব্য করেছিলেন জনৈকা মার্কিন বিদুষী মহিলা, মিসেস্ ফাঙ্কে।

* * * *

আবার আমেরিকা, আবার নিউইয়র্ক।

প্রাচুর্য ও সম্পদের সেই সুপরিচিত দেশ, কর্মব্যস্ততায় প্রচণ্ড কলধ্বনি-মুখরা সেই মহানগরী। একই ভাবে চলমান তার জনস্রোত, একই গতিপথে ধাবমান তার জীবনপ্রবাহ।

নিউইয়র্কে বেদান্ত-কেন্দ্রের জন্য স্থায়ী ভবন তখন সংগৃহীত হয়েছে। স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা—স্বামী অভেদানন্দ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করছেন কেন্দ্রের যাবতীয় কাজ।

স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত হলেন, প্রীত হলেন।

এদিকে তাঁর পৌঁছ সংবাদ অচিরে চতুর্দিকে ছ'ড়য়ে পড়ল। অনুরোগী ভক্তবৃন্দ, গুণগ্রাহী বন্ধুজন ও শিষ্য-শিষ্যার অবিশ্রাম গমনাগমনে উৎসবমুখর হয়ে উঠল কেন্দ্র। বিভিন্ন স্থান থেকে আসতে লাগল আমন্ত্রণ–বক্তৃতার জন্য, ভাষণের জন্য অথবা শুধু মাত্র দর্শন লাভের জন্য।

সবদিকেই অনুকূল পরিবেশ—প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র, উৎসুক, ও জিজ্ঞাসু নরনারীর সমাবেশ ; স্বামীজীও দেখতে দেখতে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে গেলেন কর্মে। কিন্তু তথাপি,— সেদিনে আর এদিনে কতই না প্রভেদ! সেদিনের বিবেকানন্দ আর আজকের বিবেকানন্দ—এক ব্যক্তিই যেন নয়।

বাহ্যদৃষ্টিতে অবশ্য সহসা কিছু বোঝা যায় না, উপলব্ধিও করা যায়না সহজে,—কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, স্পষ্ট দেখা যায়— কত অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত এখন স্বামীজী…

জগৎরঙ্গমঞ্চের অভিনয় প্রায় সমাপ্ত করে আজ 'ঘরমুখো' বিবেকানন্দ নিরপেক্ষ দ্রষ্টামাত্র, সাক্ষীমাত্র।

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তোনিরাশ্রয়ঃ।
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব পরিগ্রহঃ।

কর্মপ্রবাহ যে কমেছে তা নয়, বরং বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে,— কিন্তু কর্মের ডাক আর এখন বিশেষ উচ্চকিত করে না তাঁকে, কানে

এসে পৌঁছায়ই না সহজে। অন্তরের অতি নিভৃতে বসে কে যেন আজকাল ডাকে, বড় করুণ সুরে মাঝে মাঝেই ডাকে—
'ফিরে চল আপন ঘরে।'

আবার, অনন্তের কোল থেকেও মধ্যে মধ্যে আসে আহ্বান, হাতছানি দিয়ে ডাকার সেই একই ইঙ্গিত—

'সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে?'
কেন ভুলেছ আপন জনে?...

এই সময়, একদিন তাই কথা-প্রসঙ্গে, আত্মগতভাবেই স্বামী অভেদানন্দকে স্বামীজী বলেছিলেন—দেখ ভাই, আমার মনে হয়, কেবলই মনে হয়—এ-জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। খুব বেশী হলে আর তিন চার বৎসর এ দেহ থাকবে -তার বেশী নয়।

গুরুভ্রাতা দুঃখিত হন, উদ্বিগ্ন হন—প্রতিবাদও করেন। বলেন—কেন ভাই, তোমার শরীর তো এখন অনেকটা সেরেছে। আর কয়েকমাস এখানে থাকলেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

তুমি আমাকে বুঝতে পারনি ভাই—মৃদুহাস্যে উত্তর করেন স্বামীজী—আমি যেন দিনে দিনে অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছি। এ ক্ষুদ্র দেহপঞ্জর আর আমার বিরাট সত্তাটিকে ধরে রাখতে পাচ্ছে না। মনে হয়, আমি যেন ফেটে যাব—চৌচির হয়ে ফেটে যাব

তথাপি কিন্তু কর্মপ্রবাহ বাহ্যতঃ একইভাবে চলতে থাকে, একইভাবে প্রসারিত হতে থাকে।

*　　*　　*　　*

নিউইয়র্কে কয়েকদিন বাস করে—সেখান থেকে কালিফোর্নিয়া, কালিফোর্নিয়া থেকে লস্‌এঞ্জেলস্‌ গিয়েছিলেন স্বামীজী।

লস্‌এঞ্জেলসে কেটেছিল তাঁর কয়েকমাস এবং সেখানকার বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে অনেকগুলি বক্তৃতাও প্রদত্ত হয়েছিল। তারপর সানফ্রান্সিস্কো। সেখানেও কিছু দীর্ঘদিন কাটালেন তিনি এবার এবং কতকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ বক্তৃতাও এই সময় প্রদান করলেন শহরের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে—

জগতে বুদ্ধের বাণী,

জগতে যীশুখ্রীষ্টের বাণী,

জগতে শ্রীকৃষ্ণের বাণী

বেদান্তধর্ম কি ভাবীকালের ধর্ম

ইত্যাদি অনেকগুলি বক্তৃতা এই সময়েই প্রদত্ত হয়েছিল।

এই সময়ের একটি ছোট ঘটনা এখানে বিবৃত করব।

শহরের কোন একটি ছোট নদীতীরে—একদিন অপরাহ্ণে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন স্বামীজী।

নদীর উপর একটি সাঁকো। মাঝারি ধরনের সাঁকো। বেড়াতে বেড়াতে সেই সাঁকোর উপর গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

দেখলেন, সাঁকোর উপর থেকে কয়েকজন যুবক জলের উপর ইতস্তত:-ভাসমান কতগুলো ডিমের খোসা গুলিবিদ্ধ করবার চেষ্টা করছে—কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেও সফল হতে পাচ্ছে না।

দ্রুত-স্থান পরিবর্তনশীল খোসাগুলি তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে যেন সরে সরে যাচ্ছে। অদূরে দাঁড়িয়ে স্বামীজী দেখছিলেন দৃশ্যটি আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। হঠাৎ যুবকদের দৃষ্টি পড়ল তাঁর দিকে, আর তাঁকে হাসতে দেখে—নিতান্ত অপমানিত বোধ করে—তাদের এক জন তক্ষুনি গিয়ে চ্যালেঞ্জ করল স্বামীজীকে। বলল, আপনিই গুলি করুন দেখি, হাসছেন তো খুব! কাজটা যত সহজ মনে করছেন তত সহজ নয়।

স্বামীজী কোন উত্তর না দিয়ে তাদের একজনের হাত থেকে একটি বন্দুক চেয়ে নিলেন এবং অব্যর্থলক্ষ্যে পর পর দশবারোটি

খোসা গুলিবিদ্ধ করে বন্দুকটি তাদের ফিরিয়ে দিলেন। যুবকদল। নির্বাক, স্তম্ভিত। তারা স্বামীজীকে একজন অদ্বিতীয় শিকারী বলে স্থির করে নিল। কিন্তু তাদের বিস্ময় বহুগুণ বর্ধিত হল যখন তারা শুনল স্বামীজী জীবনে সেই প্রথম বন্দুক ধরেছেন, সেই প্রথম লক্ষ্য ভেদ করেছেন। ইতিপূর্বে আর কখনো তিনি বন্দুক স্পর্শ করেন নি।

কি প্রকারে তবে এ-অসম্ভব সম্ভব হল—তাই জানবার জন্য যুবকদল অবশেষে প্রশ্ন করল স্বামীজীকে।

চলতে চলতে স্বামীজী শুধু বললেন···চিত্তের একাগ্রতায় ও মনঃসংযমে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। একাগ্র চিত্ত এবং সংযত মনের নিকট কিছুই অসম্ভব নয়।

* * * *

এই কালিফোর্ণিয়া ও সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বাস কালেই স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা মিস্ মিন্নি বুক্ ধ্যান-তপস্যার উপযোগী একটি নিভৃত-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য লোকালয় থেকে বহুদূরে বিরাট এক ভূমিখণ্ড তাঁকে দান করেছিলেন।

একশত ষাট একর পরিমিত সেই ভূখণ্ডে, অরণ্যানী-পরিবৃত নিসর্গের সেই রম্যনিকেতনেই যথাকালে স্থাপিত হয়েছিল অধুনাখ্যাত শান্তি-আশ্রম,—PeaceRetreat.

স্বামীজী স্বচক্ষে সে-স্থানটি দেখবার সুযোগ পান নি, কিন্তু সে-স্থানের একান্ত শান্ত-বিজনতার বিবরণ শুনে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। গুরু-ভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে সে আশ্রমের ভার প্রদান করে পাঠাবার প্রাক্কালে বলেছিলেন···

যাও ভাই, শান্তি-আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর গে। বেদান্তের বিজয়কেতন উড্ডীন কর গে। নিজের কথা ভুলে যাও, দেশের কথা ভুলে যাও।

তারপর নিজের জীবন-পুঁথির একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেই যেন

বলেছিলেন ··সর্বোপরি, আদর্শ জীবন যাপন কর, ধ্যান-সমৃদ্ধিতে নিজের জীবন-পদ্মটি প্রস্ফুটিত কর, —তারপর আর যা-কিছু প্রয়োজন মা স্বয়ং করে দেবেন।

'Live the life···Live the life···and the Mother will see to the rest.

প্রত্যুত, স্বামীজীর সমগ্র জীবনবেদ পর্যালোচনায় এই কথাটিই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে আত্মবিশ্বাস ও ভগবদ্‌বিশ্বাস যুগপৎ পাশাপাশি থেকে তাঁর অভিনব জীবনটি নিয়ত নিয়মিত করে এসেছে।

আবার, ইদানীং ব্রত-উদ্‌যাপিত জীবনাপরাহ্ণে সে বিশ্বাস ও নির্ভরতা যেন অকল্পিত গভীরতা ও সর্বাবয়বতা লাভ করেছিল। তাঁর সহজাত সাধারণ মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যে তাতে কিছুমাত্র হ্রাস হয়েছিল তা নয়। ইচ্ছামত বিরাট ব্যক্তিত্বের অনতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার ক'রে—নেত্রকোণ থেকে বহ্নিকণা বিনির্গত করে বিরুদ্ধ শক্তিকে মুহূর্তে মলিন করে দেবার অমিত-শক্তিতে পূর্বেরই মত তিনি শক্তিমান ছিলেন। যুক্তি-বিস্তারে এখনো তিনি অপ্রতিদ্বন্দী। তপস্যা দীপ্তিতে ও প্রেমের স্নিগ্ধতায় অতুলনীয়, ভাস্বর।

কিন্তু তথাপি অন্তরে অন্তরে, ভাবের ফল্গুপ্রবাহে এখন তিনি একেবারে উদাসীন, মহামায়ার মহতী ইচ্ছাস্রোতে একান্তভাবে ভাসমান।

সমস্ত শাস্ত্রতর্কের, কর্ম-কোলাহলের তরঙ্গবিক্ষেপ স্তব্ধ করে মাঝে মাঝেই ভেসে উঠে সেই বহুদিন-বিগত যৌবন-প্রত্যুষের স্বপ্ন-মাখান দিনগুলির কথা,—

দক্ষিণেশ্বরের দেবদেউলে, পুণ্যতোয়া সুরধুনীর তীরে—শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে ধ্যান-তপস্যার অব্যাহত আনন্দধারায় কেটেছিল যে মধুময়, উদ্দীপনাময় দিনগুলি—সেই দিনগুলির কথা।···

উত্তরকালে মহাকবি যেমন বলেছিলেন,…

এ-দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে লয়েছি আজি তুলি,
এ মহামন্ত্র খানি।
চরিতার্থ জীবনের বাণী।—

তেমনি কর্মবন্ধন ছিন্ন করে, দেহবন্ধন ছিন্ন করে—নিস্তরঙ্গ সমাধি সায়রে ডুব দেবার জন্য তিনি বিশেষ উন্মুখ হয়েছিলেন এইকালে…

'A longing for the Absolute, longing to break all bounds and fly in to the Highest'—এই ছিল তাঁর এ-সময়কার নিগূঢ় মনোভাব।

সেইজন্য দেখা যায়, এই কালিফোর্ণিয়া বাসের নিরতিশয় কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেই—যখন বহুমুখী সমস্যা, অসংখ্য নর-নারীর ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ জটিলতা তাঁকে একান্তভাবে কর্মে লিপ্ত করে রেখেছে তখনই অন্তরজীবনের তদানীন্তন অবস্থার সামান্য একটু পরিচয় দিয়ে জনৈক শিষ্যস্থানীয়াকে তিনি লিখেছেন,…

কর্ম করা কঠিন…সব সময়ই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা করো যেন চিরদিনের মত আমার কর্ম শেষ হয়ে যায়।…

আমি ভাল আছি। মনের দিক দিয়ে খুবই ভাল আছি। শরীরের চাইতে মনের স্বাচ্ছন্দ্যই অধিক বোধ কচ্ছি …

লড়াইয়ে হারজিত দুই-ই হ'ল, এখন সেই মহান-মুক্তিদাতার অপেক্ষায় আমি পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে আছি।

অব শিব পার কর মেরে নেইয়া।

জীবনের প্রভাতকালে একদা যে মুগ্ধমতি একটি বালক—দক্ষিণেশ্বরের অশ্বত্থমূলে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত অপূর্ব, অপার্থিব বাণী শুনতে শুনতে অবাক হত, তন্ময় হয়ে যেত—সেই বালক-ভাবটিই আমার যথার্থ স্বরূপ, যথার্থ পরিচয়।

আর কাজকর্ম. ভালো মন্দ যা কিছু করা গেছে…সে-সব তারি উপর আরোপিত কতকগুলি উপাধিমাত্র।

আবার এখন আমি সেই গম্ভীর মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, সেই পুরাতন ও একান্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর…যাতে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত কণ্টকিত হচ্ছে …বন্ধন খসে যাচ্ছে…কর্মকোলাহল বিস্বাদ বোধ হচ্ছে, জীবনের প্রতি সকল আকর্ষণ বিলুপ্ত হচ্ছে।

ঐ, ঐ তাঁর আহ্বান শুনতে পাচ্ছি…মৃতের সৎকার মৃতেরা করুকগে…সংসারের ভালো-মন্দ সংস্কার সংসারীরা দেখুকগে—তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়।…

যাই- প্রভু, যাই।

ঐ নির্বাণের মহাসমুদ্র আমি সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি- তরঙ্গহীন, উর্মিহীন, প্রশান্ত ও অ-বিক্ষোভ সে মহাপারাবার।

আমি যে জন্মেছিলুম—তার জন্য আমি খুশী আছি। এ-জীবনে যে বহু দুঃখভোগ করেছি, বহু ভুল ভ্রান্তি করে বসেছি তার জন্যও খুশী আছি—আবার এখন যে নির্বাণের মহাসমুদ্রে ডুব দিতে চলেছি—তাতেও খুশী আছি।

কোন বন্ধন নিয়ে এ সংসারে আমি আসিনি, কোন বন্ধন নিয়ে যাচ্ছি না। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি আসুক—অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই।

পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য গেছে—আর ফিরছে না।

শিক্ষাদাতা ও গুরু বিবেকানন্দ, নেতা ও আচার্য বিবেকানন্দ

সরে গিয়ে পূর্বেকার সেই বালক, প্রভুর সেই চরণাশ্রিত দাস আবার আত্মপ্রকাশ করেছে।

পূর্বে আমার কর্মের পশ্চাতে উচ্চাভিলাষ থাকত—পবিত্রতার পশ্চাতে শঙ্কার ভাব থাকত—শিক্ষাদানের পশ্চাতেও বোধ করি কর্তৃত্বের ছোঁয়াচ থাকত,···আজ সে সব নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে ··আর আমি ভেসে চলেছি কালের নিস্তরঙ্গ, শান্ত প্রবাহে—নিশ্চেষ্ট হয়ে, হাত-পা একেবারে ছেড়ে দিয়ে।

যাই মা, যাই।···

সকল কর্তৃত্ব বিসর্জন দিয়ে—অভিনেতার সকল ভূমিকা পরিত্যাগ করে দ্রষ্টারূপে, সাক্ষীরূপে,—যেখানে তুমি নিয়ে যাবে—শব্দহীন, সীমাহীন সেই রহস্যময় প্রদেশে তোমার স্নেহময় বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আর আমার কোন দ্বিধা নেই।···

শান্তি, কেবল শান্তি।···সর্বচরাচর ব্যপ্ত করে প্রশান্ত আনন্দের ধারা কা অব্যাহত স্রোতে বহমান। চিন্তাগুলি যে মনে উদিত হচ্ছে তাও যেন কোন্ দূরান্ত থেকে, অন্তরের কোন্ গভীর নিভৃত প্রদেশ থেকে অতি ক্ষীণ, অস্পষ্ট ধ্বনির মত ভেসে আসছে।

চারদিকে যা-কিছু দেখছি—সবই যেন প্রাণহীন, ছায়ার মত মনে হচ্ছে। নিদ্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তটিতে—মানুষ যেমন অনুভব করে—জীবনও নয়, মৃত্যুও নয়—অথচ এ দুয়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা ··ঠিক তেমনি অস্পষ্ট ও স্বপ্নময় অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি ভেসে চলেছি।···

এমনি একখানা, দু'খানা নয়···খুঁজে বের করলে দেখা যাবে অক্ষয়-লিপির ভাষা-বন্ধনে একালের অন্তর-জীবনের আংশিক পরিচয়কে তিনি বহুস্থানে এইভাবে সীমায়িত করে রেখে গেছেন আমাদের জন্য।···এবং শুধু চিঠির মধ্য দিয়েই নয়—তাঁর এই

কালের বক্তৃতা, শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুর ভিতর দিয়েও সেই একই সুর ধ্বনিত ··

'মন চল নিজ নিকেতনে।'

সকল বন্ধন চূর্ণ করে—ভূমার বাধাহীন, দ্বিধাহীন, অন্তহীন আনন্দসায়রে ঝাপিয়ে পড়, অবগাহন কর, মগ্ন হও। পিছনের দিকে তাকিও না, অনুশোচনা করো না। অনন্ত জীবনের তোমরা অধিকারী, হে অমৃতের সন্তানগণ!

Don't repent, Don't repent !

Spit, if you must, but go on.

Throw oft the load of sin, if there is such a thing—by knowing your true selves ;—The Pure, the Ever Free ! That man is blasphemous who tells you that you ate sinners,···

তা ছাড়া ইদানিং আবার বক্তৃতার শেষে প্রায়ই প্রশ্ন আহ্বান করতেন স্বামীজী এবং প্রশ্নোত্তর শেষ হলে,—কখনো কখনো অনুরাগী শিক্ষার্থীদের নিয়ে কার্যকরীভাবে শিক্ষা দেবার জন্য—ক্লাস ঘরেই পদ্মাসনে ধ্যানে বসে পড়তেন এবং শিক্ষার্থীদেরও তাঁর সঙ্গে বসে ধ্যানাভ্যাস করতে নির্দেশ দিতেন।

দুর্লভ, সুদুর্লভ সে-সব অপার্থিব ও শান্ত মুহূর্তগুলি।

ভাগ্যবান বহু নরনারীর জীবনে দেবতার আশীর্বাদের মত যেন স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ত তারা।

স্বামীজী ধ্যানে বসতেন, আর মুহূর্তে—প্রশান্ত, স্তব্ধ পরিবেশে গৃহের অভ্যন্তর দেবভূমিতে পরিণত হত। একটি দিব্য আবেশে, একটি অলৌকিক অপার্থিব উপস্থিতিতে গম্‌গম্‌ করত আকাশ-বাতাস। স্বামীজী ধ্যান করতেন।

পদ্মাসনে উপবিষ্ট, গৈরিক পরিহিত, গৈরিক শিরোভূষণ-শোভিত—অর্ধনিমীলিত চক্ষু,—একটি হাতের উপর আর একটি হস্ত স্থাপিত রয়েছে। নিবাত, নিষ্কম্প সে ধ্যানমূর্তি প্রস্তরমূর্তির মতই তখন প্রতিভাত হত।

'Seated cross-legged on divan, clothed in his Sannyasin garb, with his eyes apparently closed, he might have been a statue in bronze, so immovable was he. A Yogi, indeed! Awake only to transcendental thoughts,—

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিখুঁত বর্ণনা এটি।

সেই ধ্যান-মূর্তির প্রতিচ্ছবি—আজ শুধু বর্ণচিত্রে আর মসী-লিপির বর্ণনায় ছাড়া অন্য কোন সূত্রে চমচক্ষে দেখতে পাবার আমাদের পথ নেই!···

কিন্তু তারই অক্ষয় স্মৃতি পশ্চাতে রেখে—তাঁর জীবনের প্রথম কর্মস্থল, বর্তমানযুগে বহির্ভারতে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রথম প্রচার-ক্ষেত্র—নূতন গোলার্ধের তটভূমি ত্যাগ করে—আমরা বিদায় হলাম।

বিদায় হলাম সেই দিন,—সন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই—যেদিন আমেরিকা ত্যাগ করে ইউরোপের উদ্দেশ্যে পুনঃ যাত্রা করেছিলেন স্বামীজী।···

বস্তুত, আমেরিকার বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষতা থেকে সেই তাঁর শেষ বিদায়।

ইহজীবনে আর সে দেশে তাঁর যাওয়া ঘটেনি।

*　　　*　　　*

আজ তাঁর দেহত্যাগের কত বৎসর অন্তে—সে-মহাদেশকে, আর তার গুণগ্রাহী, উদার-চরিত অসংখ্য নর-নারীকে···আমরা প্রণতি জ্ঞাপন করি—যে দেশ ও যে বিদগ্ধ সমাজ প্রথম চিনেছিল ও

অভিনন্দিত করেছিল স্বামীজীকে, প্রশস্ত কর্মক্ষেত্রের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করেছিল তাঁর সম্মুখে।

উত্তর জীবন সে-দেশের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পবিত্র দিবস, ৪ঠা জুলাই তারিখটিকে ছন্দ-গাথায় তিনি স্বয়ং অভিনন্দিত করেছিলেন এবং আরও পরে, সন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ঐ বিশেষ তারিখটিতেই পৃথিবীর বুক থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং মহাসমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন। তৎরচিত '৪ঠা জুলাই' শীর্ষক কবিতাটি এইরূপ ছিল :—

হের বিগলিত, নিবিড় কৃষ্ণ বারিদ-পুঞ্জ গগনে,
সারা নিশি ধরি ধরণী আবরি' ঘন ঘোর আবরণে,
ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তোমার জাগিয়া উঠিল ধরা
বিহগ মুখর কুঞ্জকানন বন্দনা-গীতি ভরা।
তারকা নিন্দি' শুভ্র-শিশির-কিরীট পরিয়া শিরে,
তব আবাহনে পুলকে আকুল কুলকুল কাঁপে ধীরে।
পূজাসম্ভার প্রেমপূরিত বক্ষে সাজায়ে রাখি,
সরসী মেলিল তোমারে হেরিতে অযুত কমল আঁখি
বিশ্ব তোমারে বরিয়া লইল, সেদিন এসেছে আজ,
নব আবাহন করগো গ্রহণ আলোকের অধিরাজ।

আজি হে অরুণ করুনায় তব মুগ্ধ জগৎবাসী,
মুক্তি ছড়ায়ে হাসিল তোমার কান্ত কিরণ রাশি।
ভাবি দেখ তুমি, নিখিল বিশ্ব তোমার দরশ তরে,
ভরি যুগচয়, খুঁজিল তোমায়, কত না প্রদেশ 'পরে।
ছাড়ি কতজন, গৃহ পরিজন, ছিঁড়িয়া প্রণয়-ডোর,
লভিতে তোমায় লঙ্ঘি' সাগর, পশিল কানন ঘোর।
প্রতি পদে দলি শতেক বন্ধ পরাণ শঙ্কাহীন,

তবে তো পূর্ণ করিয়া চেষ্টা উদিল পুণ্যদিন।
সফল হইল সাধনা ও প্রেম, সার্থক বলিদান,
সকল বেদনা ধন্য করিয়া সিদ্ধি লভিল স্থান।

তারপর তুমি, মঙ্গলালয় জাগিয়া উঠিলে ধীরে,
মুক্তি-কিরণ বরষি হরষে বিশ্ব-মানব-শিরে।
চল অবিরাম বাধহীন পথে—জগৎ করিতে তৃপ্ত,
—গগন কেন্দ্রে হে দেব ছড়ায়ে মুক্তি-কিরণ দীপ্ত!
প্রতি প্রদেশের প্রাত নরনারী উন্নত শির তুলি,
হেরুক আনন্দে বন্ধন পাশ নিঃশেষে গেছে খুলি।

প্রফুল্ল নবীন জীবন লভিয়া হউক সফল প্রাণ,
মুক্তির দিন! আজিকে সবারে স্বাধীনতা কর দান।'

আর সেই অবকাশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি সেই পুণ্যশ্লোক মনীষীকে—যাঁর প্রতিভায় ও পাণ্ডিত্যে, সাধনায় ও প্রযত্নে—বহুকালের ভ্রষ্ট-গৌরব ও লুপ্ত-মর্যাদা ভারতবর্ষ, পুনর্বার সমাদৃত হয়েছিল বিশ্বের দরবারে।

ছন্দ-মালিকা রচনা করে বলি,—

তুমি মহা-প্রাণ বিবেকানন্দ
চিরযৌবন, মৃত্যুঞ্জয়ী,
গত-অনাগত মিশেছে তোমাতে—
তুমি কালাতীত সত্যাশ্রয়ী।
নিত্যমুক্ত, সন্ন্যাসী তুমি
নিষ্কাম যতি, সিদ্ধধ্যানী,
আর্তজনের অশ্রু মোছাতে
বহিয়াছে শিরে ব্যথার গ্লানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সুত তুমি প্রভু,
এ-যুগের নব-বার্তাবহ।
শক্তিমন্ত্রে এনেছ চেতনা—
জাতির শ্রদ্ধা, প্রণতি লহ

*   *   *   *   *

১লা আগস্ট, সন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।

২০শে জুলাই, আমেরিকা ত্যাগ করে—ঐদিন তিনি পৌঁছেছিলেন ফরাসীর রাজধানী, নগরী-প্রধানা প্যারীতে।

প্যারীতে তখন আহূত হয়েছে বিশ্ব-ধর্ম-ইতিহাসের এক সম্মেলন—Congress of the History of Religions.

মুখ্যতঃ, সেই সম্মেলনে যোগ দিতেই অবশ্য তিনি গিয়েছিলেন প্যারীতে—কিন্তু তাঁর তিন-চার মাসের প্যারী অবস্থান কালে তত্রত্য বহু খ্যাতনামা মনীষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, শিল্পে ও সাহিত্যে যাঁরা ফরাসী সমাজের মুকুটমণি তাঁদের অনেকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছিল এই কালে।

তারপর অক্টোবর মাসের শেষদিকে—প্রসিদ্ধ ফরাসী গায়িকা মাদাম কাল্‌ভের অতিথিরূপে কতিপয় বন্ধু ও শিষ্য-শিষ্যা সমভিব্যাহারে মিশরাভিমুখে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল।

মাদাম কাল্‌ভের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটিও বিচিত্র।

একদা, স্বামীজীর আমেরিকা জীবনের প্রথমার্ধে, এক প্রচণ্ড বিপর্যয়ের পটভূমিতে মাদাম কাল্‌ভে স্বামীজীর পুণ্যদর্শন লাভ

করেছিলেন। তখন তাঁর একমাত্র কন্যাটির আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে এবং স্বভাবতঃই তাঁর অন্তরে শোক ও অশান্তির বহ্নিজ্বালা যেন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। সেইজন্য জনৈকা বান্ধবীর নির্বন্ধাতিশয়েই তিনি স্বামীজীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন।

কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই মাদাম কাল্‌ভে যেন স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে ও ব্যবহারে এককালে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সমগ্র মনোভূমিতে নূতন উষার আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল। আপন সন্তান বলে সম্বোধন করে, নিজ সান্নিধ্যে গ্রহণ করে আর নিজ অপার্থিব অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে ধীরে ধীরে তাঁর সকল অন্তর-বেদনার মূল উৎপাটন করে স্বামীজী তাঁকে শান্তির প্রশস্ত পথে হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন প্রথম সাক্ষাতের দিনটিতেই।

স্বামীজীর বৃহদায়তন জীবনীগ্রন্থে এ-কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।...

সে যাই হোক, মিশরাভিমুখে অগ্রসর হয়েই—পথে ভিয়েনা, কনস্টান্টিনোপল্, স্কুটারি প্রভৃতিও পরিদর্শন করেছিলেন স্বামীজী এ যাত্রায়।...

তারপরই মিশর।...

যে মিশরের প্রান্ত দিয়ে অল্প কিছু দিন পূর্বেই জলপথে তিনি ইউরোপ গিয়েছিলেন, অথচ সেখানে প্রবেশ করেন নি, আজ তার বহু পুরাতন-স্মৃতি-বিজড়িত মাটিতে পদার্পন করে—প্রাচীন নিদর্শন-গুলিকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল স্বামীজীর।

কত যুগ, কত শতাব্দী, ও মন্বন্তরের রূপকথার কাহিনী সে-সব। একদা পার্থিব সম্পদ ও শক্তির একচ্ছত্রাধিপতিরূপে—অখণ্ড প্রতাপে যারা সে দেশের মাটিতে রাজত্ব করত—মৃত্যুর পরেও অমর থাকবার

দুর্দম আকাঙ্ক্ষার যাদের অবধি ছিল না—আজ সর্বগ্রাসী মহাকাল তাদের সকল চিহ্ন লুপ্ত করছে, নিঃশেষ করছে।

শুধু বিগত দিবসের মূক-সাক্ষ্যস্বরূপ—মিশরের মহাশ্মশানে অবিচল দাঁড়িয়ে আছে—বিশালকায় পিরামিডগুলো, স্ফিংক্সগুলো, আর কাইরোর সংগ্রহশালার বিচিত্র স্মৃতিচিহ্নগুলো।

স্বামীজীর একান্ত অন্তর্মুখী উদাস-মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এরা। এদের দেখতে দেখতে অন্তরের অবচেতনে প্রবেশ করে জীবনের শেষ পৃষ্ঠাগুলি শেষবারের মত যেন উল্টিয়েছিলেন স্বামীজী। নীল নদের তটভূমির অবর্ণনীয় নৈসর্গিক মাধুর্যও তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি। তাঁর সহযাত্রীদের অন্যতম লিখেছিলেন—

প্রথমে প্যারীতে, তারপর মিশরে, সে সময় এটা প্রায়ই লক্ষ্য করা যেত তিনি যেন অনাসক্ত দ্রষ্টারূপে জীবন-পুঁথির পাতা উল্টিয়ে চলেছেন। এ পৃথিবীর পরিধি থেকে দূরে, অতিদূরে তাঁর মন যেন নিয়ত বিচরণ করছে নিঃসঙ্গ ও একক।

In Paris, often-times his mind had been far aloof from his environment ; and here in Egypt it seemed as if he were turning the last pages in the Book of Experience.

নিরবচ্ছিন্ন একটি চিন্তাধারা, অব্যাহত একটি ধ্যানতন্ময়তা এ-সময় তাঁকে যেন এককালে আচ্ছন্ন করেছিল। যাঁরা অশেষ সৌভাগ্যবশে সেকালে তাঁর সঙ্গে ছিল, প্রত্যেকেই সে অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিল। আর উপলব্ধি করেছিল তাঁর ক্লান্তি, বিশ্ব-বিষয়ে ক্লান্তি, জগৎ-বিষয়ে অপরিসীম অনাসক্তি ও একান্ত ঔদাসীন্য…

And he who was with him at the time, said :
'How tired and world-weary he seemed !'

*   *   *

তারপর, মিশরে অবস্থানের কয়েকদিন মধ্যেই সহসা একদিন মাতৃভূমির আহ্বান যেন তাঁর কানে পৌঁছাল এবং কিছুমাত্র বিলম্ব না করে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে ফিরবার সঙ্কল্প করেছিলেন স্বামীজী এবং সহযাত্রী সবাইকে আশীর্বাদ করে, প্রথম-প্রাপ্ত জাহাজেই ভারতবর্ষ অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। পথে আর কোথাও বিলম্ব করেননি, পূর্বাহ্ণে কাউকে কোন সংবাদও দেননি। একেবারে সোজা মিশর থেকে, বোম্বাই হয়ে দ্বিতীয়বার পৃথিবী পরিভ্রমণ সমাপ্তকরে—৯ই ডিসেম্বর, অনেক রাত্রে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করেছিলেন !

বিপুল আনন্দ-কোলাহলে মঠবাসী সকলে তাঁদের অতি-প্রিয় স্বামীজীকে নিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিল সেদিন। কত কথা, গভীর স্বর্গীয় প্রেমের কত বিচিত্র আদান-প্রদান হয়েছিল সেদিন। অতি মধুর সে কাহিনী, অতি মর্মস্পর্শী সে আখ্যায়িকা। কিন্তু তার বিস্তৃত আলোচনা আমরা এখানে করছি না।

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ ও বিরাট জীবনের চরম অধ্যায়ে এসে এইখানেই এ-পর্যায় শেষ করছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে তাঁর যে ভ্রমণ-কাহিনী এ পর্যায়ে অতি-সংক্ষেপে আমরা বিবৃত করলাম তার ভিতর দিয়ে সে অলোক-অধ্যাত্ম প্রকৃতির কতটুকু প্রকাশিত হয়েছে—মোটেই কিছু প্রকাশিত হয়েছে কিনা—জানিনা।

পূর্বদিগন্তে উদয়-উন্মুখ সূর্যের যে কনক-কিরণ দিবারম্ভে ধরিত্রীর বুকে সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ে—পশ্চিম দিগন্তের অস্তাচলশায়ী সূর্য-

রশ্মির সঙ্গে তার প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে, থাকাই স্বাভাবিক। প্রদীপ্ত সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান স্বামী বিবেকানন্দের জয়যাত্রার পথের উদায়াচলে এবং অস্তাচলেও ঠিক সেই পার্থক্যই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল এবং সেই কথাটিই এ পর্যায়ে আমরা প্রকাশ করতে'চেষ্টা করেছি। প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি, ঘটনার পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে, ভগিনী নিবেদিতার সেই অনবদ্য উক্তিটি···

The outstanding impression made by the Swami's bearing during all these months of European and American life—was one of complete indifference to his surroundings···

Both victory and defeat would come and go. He was their witness···

তবে, অন্তর বাহিরের এই দুই গতিস্রোতের মধ্যে শুধু একটি ধারা ছিল নিত্য অব্যাহত, একটি কামনা ছিল অচঞ্চল দীপশিখার মত নিত্য ঊর্ধ্বমুখে দীপ্যমান,—কল্যাণ হোক, শুভ হোক বিপুলা পৃথিবীর, সম্পদ সচ্ছলতায় পূর্ণা হোক জীবধাত্রী বসুধা নিরাময় হোক আধিহীন, ব্যাধিহীন হোক মানবসমাজ···

কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী,
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতঃ লোকাঃ সন্তু নিরাময়া।

—*—

* শেষ কথা *

বেলুড় মঠ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অস্থি-পূত গঙ্গার পশ্চিম তীরের নিজস্ব মঠবাটী।

আজ সে মঠবাটীর বিপুল বিস্তার অতি দূর থেকে দৃশ্যমান। দীর্ঘ পরিধির মধ্যে অসংখ্য ছোট-বড় বাড়ী, ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু মন্দির, আর তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সবুজ পত্রবহুল অসংখ্য গাছপালা। সম্মুখে খর-বাহিনী গঙ্গা। সে এক অনুপম, অভিনব সৌন্দর্য।

কিন্তু স্বামীজীর জীবিতকালে মঠের পরিধি এত বিস্তৃত ছিলনা—অনেক ছোট ছিল। বাড়ীঘরও ছিল সামান্য দু'চারটি। তবে প্রকৃতির শ্যামলিমা ছিল গাঢ়তর। আর সমগ্র পরিবেশটি ছিল অনবদ্য শুচিতায় মণ্ডিত।

তাই, বহুদিন পর পুনর্বার প্রকৃতির সে রম্য পরিবেশে নিজ হাতে গড়া মঠ-বাটীর সে শান্ত ও পূত আবহাওয়ায় প্রত্যাবর্তন করে—ক্লান্তদেহ স্বামীজী, বিশেষ তৃপ্তি বোধ করেছিলেন, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিলেন। কিন্তু সতের আঠার দিন মাত্র মঠে যাপন করেই এবার তাঁকে বিশেষ কারণে যাত্রা করতে হয়েছিল হিমালয়ের দিকে।

মিশরে অবস্থান কালের একেবারে শেষদিকে—তাঁর মনে যেন

একটা অমঙ্গলের পূর্বাভাস জেগেছিল। যাকে প্রিমনিশন্ বলে ইংরেজীতে, তারই প্রভাবে যেন তিনি জানতে পেরেছিলেন—তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্য মায়াবতী অদ্বৈত-আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিঃ সেভিয়ার আর ইহজগতে নেই।

মঠে এসে জানলেন তাঁর প্রিমনিশন্ মিথ্যা নয়। মি. সেভিয়ার সত্যই দেহরক্ষা করেছেন। সুতরাং তদীয় বিধবা পত্নীকে দেখতে ও সান্ত্বনা দিতে একবার মায়াবতী যাবার জন্য ব্যগ্র হলেন স্বামীজী এবং সেই জন্যই—আঠার দিন মাত্র মঠে যাপন করেই একবার মায়াবতীর উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেছিলেন।

সন ১৯০০-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। অতি প্রচণ্ড তীব্রতায় শীত নেমেছিল সে বৎসর হিমালয়ে। ধোনা তুলার মত পুঞ্জ পুঞ্জ শ্বেত তুষাররাশিতে আবৃত হয়েছিল মায়াবতীর পর্বতগাত্র ও সানুদেশ। সেই অকলঙ্ক তুষারের দেশে—মায়াবতী আশ্রমের একান্ত নির্জন এবং ধ্যান-তপস্যার পরমোপযোগী নিজস্ব বাটী দেখে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন স্বামীজী।

উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত অভিলাষী যারা, বেদান্ত সাধনার যথার্থ অধিকারী যারা - তাদের জন্য সর্বাংশে অদ্বৈত-ভাবপুষ্ট সে আশ্রমটি তাঁর যেন ঠিক মনের মতনটি হয়েছিল। অতি অল্প কয়েক দিনই অবশ্য তিনি সেখানে থাকতে পেরেছিলেন সেবার তথাপি সেই অত্যল্পকাল মধ্যেই পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের বহু ব্যক্তি তাঁর আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভে ধন্য হয়েছিল, তাঁর দর্শনলাভে চরিতার্থ হয়েছিল। নির্জন মায়াবতী আশ্রম তাঁকে পেয়ে যেন সজীব হয়ে উঠেছিল, মুখর হয়ে উঠেছিল।

আশ্রমের অনতিদূরে—ক্ষুদ্র হ্রদাকৃতি জলাশয় ছিল একটি। তারি পাশ দিয়ে নিস্তব্ধ প্রভাত-সন্ধ্যায় মিসেস সেভিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে

মধ্যে মধ্যে তিনি বেড়াতে বেরুতেন। সেই ভ্রমণকালে একদিন সেভিয়ার পত্নীকে সম্বোধন করে আত্মগতভাবেই বলেছিলেন···

জীবনের শেষদিকে কর্ম-কোলাহল একেবারে বর্জন করে—এই হ্রদের তীরে সম্পূর্ণ মুক্ত-জীবন যাপন করব আমি। কোন কাজ নয়, কোন হৈ-চৈ নয়, কেবল আপন মনে গ্রন্থরচনা···আর অরণ্য-বিহগের মত খেয়াল খুশীতে গান গেয়ে গেয়ে বেড়ান—এই হবে আমার কাজ।

মায়াবতী অদ্বৈত-আশ্রমে এ-সময়ে আর একটি কৌতুকজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল।

আশ্রমবাসীদের অন্তরের সংগোপন ইচ্ছায়ই বোধ হয় ঐ কালে আশ্রমের একটি প্রকোষ্ঠ ঠাকুরঘরে রূপান্তরিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটী প্রতিকৃতি স্থাপন করে যথারীতি তার নিত্যপূজার ব্যবস্থাও তারা করেছিলেন সেই ঘরটিতে। স্বামীজীএটি জানতেন না। তাই, একদিন অকস্মাৎ সে প্রকোষ্ঠে ঢুকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি এবং তার পূজা-ব্যবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। অদ্বৈত-আশ্রমে কোন বিগ্রহ থাকবে না, কোন আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা হবে না। শুধু, নিরালম্ব ধ্যান ও ব্রহ্মবিহার; শুধু একক বা সম্মিলিত শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা—এই হবে সে আশ্রমের কৃত্যকর্ম—এই স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু, হায় মানুষের সংস্কার! হায় মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা!···

সুতরাং, সেদিন সন্ধ্যায় সকলে যখন স্বামীজীর কক্ষে সমবেত হলেন, তখন স্বামীজী বলেছিলেন সে-কথা।

বলেছিলেন, অদ্বৈত আশ্রমের অন্তেবাসীগণ কোন বাহ্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করবেনা। প্রতীকের দুর্বলতা তাঁদের জয় করতে হবে।···

একম্, অচলম্, নির্বিকল্পম্ অদ্বৈতম্…এই হবে তাদের ধ্যান, তাদের মন্ত্র।…

তবে ঠাকুরঘরটি উঠিয়ে দেবার কথাও অবশ্য তিনি বলেন নি।…

বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করে রহস্যচ্ছলে শুধু বলেছিলেন… ভেবেছিলাম আমাদের একটা আশ্রমও অন্ততঃ যথার্থ অদ্বৈত সাধনার কেন্দ্রস্বরূপ থাকবে। কিন্তু মায়াবতীতে গিয়ে দেখি সেখানেও 'বুড়ো' জাঁকিয়ে বসেছে।

সে যাই হোক, মায়াবতীর তীব্র শীত ও পাহাড়ের অতি-উচ্চতা তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যে সহ্য হল না। অল্প কয়েকদিন পরই মায়াবতী ত্যাগ করে নিম্ন সমতলে নেমে আসতে তিনি বাধ্য হলেন। মায়াবতী থেকে টনকপুর হয়ে পিলিবিট এবং পিলিবিট থেকে একেবারে সরাসরি কলকাতা চলে আসলেন স্বামীজী।

পথে আর কোথাও থামলেন না, কোথাও অপেক্ষা করলেন না।

পিলিবিটের পথের একদিনের কথা।…

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত ও অভ্রান্ত ভবিষ্য-দৃষ্টির উল্লেখ করেছিলেন স্বামীজী।

বলেছিলেন,—জীবনে বহুবার, বহুরূপে যাচাই করে দেখেছি, কী সুদূরদর্শী যে ছিল তাঁর দৃষ্টি, কী অব্যর্থ ও নির্ঘাত যে ছিল তাঁর উক্তি—তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর ছোট বড় সকল কথা, সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে যথাকালে।

ভাব-ভক্তির আবেগে এই সময় নিজের সম্বন্ধেও দু'একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি নির্গত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে, অনবধানতা বশতঃই হয়ত। কারণ, নিজের কথা ক্বচিৎ তাঁর কণ্ঠ থেকে বহির্গত হত।

'আমার এ ক্ষুদ্রজীবনে যথাসাধ্য তাঁর কাজ করতে আমি চেষ্টা

করেছি। আলস্য করিনি, বিশ্রাম করিনি। নিন্দাস্তুতি তুচ্ছ করে পূর্ণ আনুগত্য নিয়ে তাঁর নির্দেশ পালন করতে প্রাণপণ করেছি আমি কখনও অন্যথা করিনি, কখনও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

Above all, above all···I am loyal! I am loyal to the core of my heart!···এমনি ধরণের কথা

মায়াবতী থেকে বেলুড় প্রত্যাবর্তন করে—জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টি মোটের উপর তিনি মঠেই যাপন করেছিলেন। অর্থাৎ, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত, প্রায় দেড় বৎসর কালের যে সময়, তার অধিকাংশ তিনি মঠেই অতিবাহিত করেছিলেন।

অব্যাহত বা একটানা অবশ্য নয়। কারণ এরই মধ্যে দু'তিনবার তাঁকে এদিক-ওদিক যেতে হয়েছিল। কিন্তু সে-সব বেশী দিনের জন্য নয়।

কী সরল, অনাড়ম্বর—প্লেইন্‌লিভিং ও হাইথিঙ্কিং-এর জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ, একেবারে শৈশব-সারল্যের মুক্ত জীবন যে এ কালে তিনি যাপন করতেন মঠে তা বলবার নয়!

তাঁর জীবনচরিতকারগণ এবং ভগিনী নিবেদিতা, স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ শিষ্য-শিষ্যাগণ সে অনবদ্য জীবনের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন।

কখনো নগ্নপদে, সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে····ধূসর ধূলির উপর বসে

সাঁওতাল দিন-মজুরদের ঘর-সংসারের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে জগতের সব কিছু তিনি বিস্মৃত হতেন।

কেষ্ট নামে একটি সাঁওতাল সর্দার তাঁর অশেষ স্নেহের অধিকারী হয়েছিল। তাঁরই সঙ্গে কথা বলতে তিনি যেন মগ্ন হয়ে যেতেন। কখনো-বা আশ্রম-পালিত ছাগশিশু, হরিণশিশু, 'বাঘা' কুকুর প্রভৃতির সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটিতে মত্ত হয়ে বালকের মত উল্লসিত হতেন। এই 'বাঘা' কুকুরটির সঙ্গে স্বামীজীর এক বিচিত্র সম্পর্ক ছিল। সে তাঁর একান্ত আশ্রিত ছিল, শরণাগত ছিল।

কথিত আছে—নানাবিধ উৎপাতের অপরাধে বাঘা একবার মঠ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। নৌকাযোগে গঙ্গার অপর পারে তাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। দুরন্ত বাঘা তাতে কোন প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেনি। কিন্তু পরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, এক মালবাহী বৃহৎ নৌকায় সকলের অলক্ষিতে সে আবার গঙ্গা পার হয় এবং গভীর রাত্রে একান্ত নিঃশব্দে স্বামীজীর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তারপর শেষরাত্রে দরজা খুলে বাইরে বের হতে গিয়েই স্বামীজী বাঘার গায়ে পা দিয়ে চমকে ওঠেন।

বাঘা ততক্ষণ স্বামীজীর দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়েছে। তার সারা দেহের আকৃতিতে, লাঙ্গুল সঞ্চালনে পূর্ণ আত্মসমর্পনের আবেদন। কণ্ঠে এক বিচিত্র করুণ আর্তনাদ।

স্বামীজীর মন সঙ্গে সঙ্গে করুণায় ভরে গেল। বাঘাকে অভয় দিয়ে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। যা, আর দুষ্টুমি করিস নি; তোকে আর কেউ কিছু বলবেনা। আমি সবাইকে বলে দেব।

আহ্লাদে উৎফুল্ল বাঘা সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে গেল। প্রাতঃকালে মঠের সকলে তো বাঘাকে দেখে অবাক। কিন্তু তাঁরা আরও অবাক

হলেন যখন পরে স্বামীজীর মুখে তার সমস্ত কাহিনীটি অবগত হলেন। বলা বাহুল্য সেইদিন থেকে বাঘা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে মঠে বাস করতে লাগল।

স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে বাঘাও মারা গিয়েছিল। তার মৃতদেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়েও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জোয়ারের স্রোতে যে-মৃতদেহটি ভাসিয়ে দেওয়া হল—ভাটার টানে সেটি আবার ফিরে এল মঠে। স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরের পাদদেশে সেটিকে দেখতে পেয়ে মঠের সকলের আর বিস্ময়ের অবধি রইল না।

বাঘার পশুজীবনেও স্বামীজীর অভয়-প্রদান অক্ষয় হয়েছে,—তাঁর পাদমূল ত্যাগ করা তার পক্ষে মৃত্যুর পরেও তাই সম্ভব হয়নি।

বাঘার মৃতদেহ তখন গঙ্গাবক্ষ থেকে তুলে নেওয়া হল। মঠপ্রাঙ্গণে, স্বামীজীর সমাধিক্ষেত্রের অনতিদূরে তার দেহও সমাহিত করা হল। যেমনি করুণ. তেমনি বিচিত্র এই আখ্যায়িকা।

*　　*　　*　　*

আবার অন্যদিকে, কত কীর্তিমান পণ্ডিত, কত ধনকুবের, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কত মনীষী বিশ্ববিজয়ী, বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে দেখতে এই সময় মঠে সমাগম হত।

কখনো কখনো, গুরুভাইদের ও নবাগত সাধু ব্রহ্মচারীদের নিয়ে রজনীর শেষযামে তিনি স্বয়ং ধ্যানে বসতেন। সুষুপ্ত ধরণীর বুকে··· নবযুগের ঋত্বিকগণ যেন অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—জীবনোৎসর্গ করবার সঙ্কল্প নূতন করে গ্রহণ করত।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি—
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

হে দেবতা-মণ্ডলি, শ্রুতিযন্ত্রে আমরা যেন কল্যাণবচন শ্রবণ করি, চক্ষে যেন সুন্দর বস্তু দর্শন করি। যেন সুদৃঢ় দেহটি নিয়ে দেবকর্মে নিয়োজিত জীবন যাপনে সমর্থ হই, কণ্ঠে যেন থাকে তোমাদেরই বন্দনাগীতি।

আর ঠিক সেই সময়, নির্মেঘ আকাশগাত্র থেকে মন্দার-কুসুমের ঝরে-পড়া পাঁপড়ির মতো প্রসন্ন সূর্যের অজস্র রশ্মিধারা, 'প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ'…সেই ত্যাগদীপ্ত জীবনগুলিকে আশিস-স্পর্শ দান করে যেত।

কখনো কখনো, ধর্মশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবে তিনি তৎপর হতেন। বেদ-উপনিষদের অধ্যয়ন ও আলোচনায় দেশবাসীকে আগ্রহশীল ও উদ্যমশীল করবার তাঁর আজীবনের যে আকাঙ্ক্ষা তা যেন এইকালে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল।

A Vedic Instiution to train teachers and preserve Aryan culture and Sanskrit learning…

তাঁর অন্তরের ঐকান্তিক এ-অভিপ্রায় বিশেষরূপে প্রকট হয়েছিল এইকালে। কিন্তু তথাপি, এইসব বেদ-বিদ্যালোচনার কালেও কখনো কখনো এমন অবস্থার উদ্ভব হত—যখন মরজগতের দুঃখ-বেদনার কোন মর্মন্তুদ কাহিনী—মুহূর্তে মায়াতীত ভূমি থেকে বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দকে টেনে আনত মায়াধীন এই মাটির পৃথিবীর বুকে। বিশাল হৃদয়ের অনুপম সহৃদয়তার অন্তরালে মুহূর্তে অবলুপ্ত হত সকল সূক্ষ্ম জ্ঞানালোচনা, সকল কঠিন বুদ্ধি-বিচার। দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় নির্গত হত করুণার তপ্ত-বারিধারা।…

গল্প নয়, কল্পনায় তৈরী মধুশ্রুতি কাহিনী মাত্র নয়। প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা এসব—মুহুর্মুহুঃ সংঘটিত হয়েছে স্বামীজীর জীবনে একালে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ছোট একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

সেদিন অপরাহ্নে ঋক্‌বেদ সংহিতার এক জটিল সূত্র ব্যাখ্যায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজী। মঠের আব্‌হাওয়া উচ্চ জ্ঞানালোচনায় সরগরম হয়ে উঠেছিল। এমম সময় প্রসিদ্ধ নাট্যকার, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত হলেন মঠে। স্বামীজীকে শাস্ত্রালোচনায় নিরত দেখে গিরিশবাবু নীরবে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন।

স্বামীজী রহস্য করে বললেন,—'কি, জি. সি! এসব অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ তো আলোচনা করে দেখলে না কখনো!'

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে প্রত্যুৎপন্নমতি গিরিশবাবু উত্তর করলেন—'না ভাই! ওসব এ জন্মে আর হল না। এবার 'জয় রামকৃষ্ণ' বলেই পাড়ি জমাতে হবে। ওসব তোমার জন্য। কিন্তু একটা কথা ভাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। বেদ-বেদান্ত তো তুমি যথেষ্ট আলোচনা করেছ, ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করতলগত। কিন্তু মানুষের দুঃখ দূর করবার, তার চোখের জল মোছাবার কোন পন্থা কি ঐ গ্রন্থে তুমি খুঁজে পেয়েছ?

এই যে কলকাতায় দেখতে পাই···আজ যার বাড়ীতে পঞ্চাশ খানা পাতা পড়ে, উৎসব-কোলাহলে মুখরিত থাকে প্রাঙ্গন·· কাল উপার্জনক্ষম গৃহকর্তা যেই চোখ বুজল অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ীতে অন্নের হাহাকার! পেট ভরে দু'মুটো খেতে পায় না, এক টুকরো জীর্ণ বস্ত্র লজ্জা নিবারণ করবার জন্য সংগ্রহ করতে পারে না, মাথা গুঁজবার একটু কুঁড়ে নেই।···

দারিদ্র্যে, অশিক্ষায়, ব্যাধিতে—ক্লিষ্ট, জীর্ণ অসংখ্য নরনারীর অপরিমেয় চিরন্তন বেদনা···তা দূর করবার কোন পথ কি তোমার

বেদ-বেদান্তের পাতায় লেখা আছে? কোন টীকা বা ভাষ্যে কি খুঁজে পাওয়া যাবে?'...

গিরিশবাবুর বলিষ্ঠ কণ্ঠের সেই বেদনা-বিদ্ধ উক্তিগুলি মুহূর্তে যেন সকলের অন্তরে গিয়ে সকরুণ আঘাত করল। বেদনার তীক্ষ্ম অনুভূতিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল অকস্মাৎ থম্ থম্ রক্তিম হয়ে উঠল। চোখের জল গোপন করবার জন্য অতি দ্রুত উঠে চলে গেলেন তিনি কক্ষ থেকে।...

স্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে আর সবাই বসে রইল। একটু পরে ধীরে ধীরে সকলকে সম্বোধন করে বললেন গিরিশবাবু...

দেখ, এই যে বিশাল প্রাণ, এই যে সীমাহীন সমবেদনা, দুঃস্থের দুঃখ-কাহিনী শুনবার সঙ্গে সঙ্গে বেদ-বেদান্ত তুচ্ছ করে—ঐ যে চোখের জল গোপন করবার জন্য উঠে চলে গেল...ঐ জন্য, বিশেষ করে ঐ জন্য,—তোমাদের স্বামীজীকে এত শ্রদ্ধা করি, এত ভালবাসি।

শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য—এসব দুর্লভ হতে পারে—কিন্তু সুদুর্লভ এ হৃদয়বত্তা।

এ জীবনে এমনটি আর কৈ?—মানুষ তো কম দেখলাম না!

*　　*　　*

এমনিভাবে, স্বামীজীকে কেন্দ্রে নিয়ে আনন্দের জীবন, তপস্যার জীবন—কর্ম ও জ্ঞানোৎকর্ষের অতি উচ্চ-জীবন—অব্যাহত যাপিত হচ্ছিল মঠে। মঠের সেই গ্রাম্য পারিপার্শ্বিকতা, গঙ্গার পূত শীকরসিক্ত শীতল বাতাস,...নিজের সেই শান্ত ঘরটি, সর্বোপরি দিনে দিনে উৎসাহী-মন ও বলিষ্ঠ চরিত্রের কর্মীদের আগমন...মঠ বাটীকে অত্যন্ত প্রিয় করেছিল স্বামীজীর কাছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অসংখ্য নরনারী তখন প্রতিদিন তাঁর কাছে আসতো—উপদেশের জন্য, নির্দেশের জন্য, দীক্ষা এবং আশীর্বাদের জন্য।

আর স্বামীজী? ·

স্বামীজী প্রফুল্ল অন্তরে—শারীরিক আধি-ব্যাধির কথা একেবারে তুচ্ছ ক'রে—তাদের তৃপ্ত করতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন, প্রেরণা দিতেন উচ্চ-জীবন লাভের জন্য, প্রেয়কে বর্জন করে, শ্রেয়কে গ্রহণ কববার জন্য। বলতেন, Work is my weak point—কর্মই আমার দুর্বলতা !·

তথাপি কিন্তু, একালের স্বামীজীর জীবনের ইতিহাস—মুখ্যতঃ তদীয় অন্তর জীবনেরই ইতিহাস। কর্ম অন্তে, দিনের শেষে,—'আপন ঘর' অভিমুখে নিঃশব্দে পদচালনারই অলিখিত সে ইতিহাস।

বাহ্যিক ঘটনা নিচয়ের কোন ইতিহাস নয়, কর্মের বহির্মুখী আহ্বানের ইতিহাসও নয়—পরন্তু, মহামায়ার মহতী ইচ্ছাস্রোতে গা-ভাসান দিয়ে তাঁরই বক্ষে শেষ বিশ্রাম লাভের জন্য অনিবার্য অথচ অলক্ষিত গতিতে পথ চলারই সে অবর্ণনীয় আখ্যায়িকা।

'অব শিব পার কর মেরে নেইয়া।'
হে শিব, আমায় পারে নিয়ে চল প্রভু। ··

সেইজন্য, মঠ-বাটী ছেড়ে অধুনা কোথাও তিনি বড় একটা যেতে চাইতেন না, গেলেও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মঠে ফিরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। তাই দেখি, মঠ-জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি পত্রে —ঠিক এই সময় না হলেও—একালেরই কাছাকাছি সময়ে, তিনি জনৈক মার্কিন শিষ্যাকে লিখেছিলেন,···

আজীবন আমি আকাশচারী পাখীর মত কেবলই ঘুরেছি। কিন্তু আজ-একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, গঙ্গার তীরে, মঠের একটি ছোট কক্ষে বসে বসে আমি লিখছি। প্যারী, কনষ্টানটিনোপল, এথেন্স, কাইরো—এসব মহানগরী তাদের উচ্ছলতা, গাম্ভীর্য ও শত ঐতিহাসিক স্মরণ-চিহ্ন নিয়ে সব পশ্চাতে পড়ে গেছে।

এখানে সবই সজীব, সবই সোনালীতে-সবুজে মেশানো, আর তাদের ঘিরে এক অদ্ভুৎ এবং অব্যাহত শান্তির অপরিমেয় স্তব্ধতা।

Verily, I am a bird of passage ! Gay and busy Paris, grim old Constantinople, sparkling little Athens and Pyramidal Cairo are left behind···and here I am now writing in my room in the Math on the Ganges ··

It is so quiet and still. Everything is green and gold···and the air is cold and crisp and delightful.

তথাপি এ কথা বলতে হবে যে -এর মধ্যেও কর্মের আহ্বান তাঁকে মাঝে মাঝেই বাইরে নিয়ে যেত।—তিনি না গিয়ে থাকতে পারতেন না। কারণ, কর্মই ছিল তাঁর দুর্বলতা ··Work was his weak point.

বস্তুত, মায়াবতী থেকে ফিরে এসে—তিন-চার সপ্তাহ মধ্যেই—পূর্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানে একবার যেতে হয়েছিল তাঁকে। আবার জীবনের শেষভাগে, দেহত্যাগের কয়েক মাস মাত্র পূর্বে কাশীধাম ও বুদ্ধগয়া দর্শনেও গমন করেছিলেন স্বামীজী। কিন্তু সেকথা পরে বলব।

এখানে শুধু এই কথাটি বলি যে, যে জগৎ-নিয়ামক মহাশক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'কালী' নামে অভিহিত করতেন, বলতেন—চিন্ময়ী মা,

সেই শক্তিই এখনো তাঁকে কর্ম থেকে কর্মান্তরে টেনে নিয়ে যেত, পূর্ণ বিশ্রাম দিতে চাইত না।

সর্বোপরি ভারতবর্ষ, তাঁর স্বপ্নের সোনার ভারতবর্ষ, Queen of his adoration যে-ভারতবর্ষ, তারি কথা, তারি চিন্তা—শত গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি-উপলব্ধির মধ্যেও, মৃত্যুর জন্য সর্বথা প্রস্তুত হয়েও যেন তিনি ভুলতে পারতেন না। তরুণ শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে প্রায়ই তাঁকে তাই বলতে শোনা যেত,—

'তোদের এত ভালবাসি, তবু মনে হয় দেশের জন্য খেটে খেটে তোরা মরে যা, আমি দেখে খুশী হই।'

*　　*　　*　　*

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে বলব। সেটি মঠের প্রথম আনুষ্ঠানিক দুর্গোৎসব।

বিলাতফেরৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম।—

সকল ভাবের, সকল মতের মিলনক্ষেত্র- রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন। গোঁড়ামি নেই, সঙ্কীর্ণতা নেই। মানুষ মাত্রেরই জন্য সে দেব-দেউল সদা মুক্ত রেখেছে তার দ্বার।

কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, বর্ণকুলীন, কূপমণ্ডুক হিন্দুসমাজ আর তার গোঁড়া চাঁই-এর দল অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সেজন্য। কুৎসায়, নিন্দায় তখন তারা পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল।

মঠের যদৃচ্ছা নিন্দা করতে—এমন কি, স্বামীজীর অকলঙ্ক শুচি-শুভ্র দেব-চরিত্রে কলঙ্কলেপন করতেও তারা পশ্চাৎপদ হয়নি।

পুরুষসিংহ বিবেকানন্দ অবশ্য কিছুমাত্র গ্রাহ্য করতেন না সেজন্য।

কখনো সম্পূর্ণ উপেক্ষার কণ্ঠে বলতেন,—'হাতী চলে বাজার মে কুত্তা ভুখে হাজার'। কোথাকার কে কি বলেছে—তার জন্য বসে বসে ভাবতে হবে নাকি ?

এ সব একদম অগ্রাহ্য করতে হবে। আবার কখনো একটু নরম হয়ে—শিষ্যদের ও গুরুভাইদেব উদ্দেশ্য করেই হয়ত বলতেন—

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

আরও বলতেন, কালে এ সব তুচ্ছ নিন্দা-কুৎসা নীরব হয়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন, 'লোক না পোক', সেই পোকসদৃশ লোকের কথায় বেশী কান দিলে চলবে কেন ?

নিঃস্বার্থ হয়ে, অনাসক্ত হয়ে, কর্ম করে যাও। সিদ্ধি অবশ্য আসবে। Victory is sure to come···

উত্তর কালে মহাকবি যেমন বলেছিলেন,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

এ যেন তারই পূর্বাভাস ছিল।

বস্তুত, হয়েছিলও তাই।

ধীরে ধীরে বিরুদ্ধবাদীর দল স্তব্ধ হয়েছিল। ধীরে ধীরে বহু 'সল', 'পলে', পরিণত হয়েছিল স্বামীজীর জীবদ্দশায়ই, এবং আজ একথাও অনেকে মনে করেন যে,—মঠের সেই প্রথমবারের সর্বাঙ্গ-সুন্দর আনুষ্ঠানিক দুর্গোৎসবই গোঁড়া সনাতনীদের বিরুদ্ধতা নিরসন করতে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করেছিল। বলা বাহুল্য, সহস্র

দীন-দুঃখীকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান সে-পূজার অন্যতম বিশেষ অঙ্গ ছিল।...

এদিকে দিন বসে নেই। সপ্তাহকে পিছনে ফেলে সপ্তাহ, মাসকে পিছনে ফেলে মাস অবিশ্রাম, অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। কাল, মহাকাল কারো জন্য অপেক্ষা করে না। স্বামীজীর স্বাস্থ্যও দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। দিন দিনই ভেঙ্গে যাচ্ছে সে বজ্রদৃঢ় বিশাল শরীর।

এইভাবেই অতীত হয়েছিল সন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ—স্বামীজীর মর্ত্যজীবনের শেষ বৎসর। এই সময়—জাপানের প্রখ্যাতনামা ধর্মযাজক রেভ রেগু ওডা আর বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক ওকাকুরা মঠে এসে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

নব-জাগরিত প্রাণ-চঞ্চল জাপান তখন দিকে দিকে নব নব বিকাশপথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আত্মশক্তিতে সচেতন হয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি সমুহের মধ্যে সম্মানের আসন লাভ কববার অদম্য প্রয়াসে সে তখন একান্ত উন্মুখ। শুধু শিক্ষা, বিজ্ঞান ও পরাবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নয়, অপরাবিদ্যার ক্ষেত্রেও তার প্রয়াস সমভাবে প্রসারিত হচ্ছে।

শিকাগোর বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনের পর—জাপানের বিশিষ্ট মনীষিগণ, ধর্মযাজকগণ—সে দেশেও একটি ধর্মসম্মেলন আহ্বান করবার জন্য ইচ্ছুক হয়েছিলেন এবং সেই জন্যই রেভারেণ্ড ওডা এবং ওকাকুরা স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। যদি স্বামীজী তাঁদের ভরসা দেন, যদি তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে সম্মত হন—তবে তাঁরা ঐ বিরাট পরিকল্পনায় হাত দিতে সাহস পান। স্বামীজী যেন অস্বীকার না করেন, যেন অসম্মত না হন—এই ছিল তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও স্বামীজী সম্মত

হয়েছিলেন। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, যাবেন তিনি জাপান, যোগ দেবেন কংগ্রেসে। —যথাসময়ে তাঁকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়।

রেভারেণ্ড ওডা উল্লসিত অন্তরে স্বদেশে প্রস্থান করলেন। কিন্তু ওকাকুরা আরও কিছুদিনের জন্য থেকে গেলেন এদেশে। স্বামীজীকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে বুদ্ধগয়া দর্শনে যেতে। আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়ে বলেছিলেন স্বামীজী তিনি যাবেন। ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণের সে পুণ্যতীর্থে এবং তারপর কাশীধামে,· যেখানে প্রথম তাঁর অমরবাণী প্রচারিত হয়েছিল কর্ম-জীবনের উদয়লগ্নে, সেখানে আনন্দের সঙ্গেই তিনি যাবেন।

It would give me the greatest pleasure to accompany you to the place where Tathagata attained Nirvana and after that to go on a pilgrimage to Benares where Buddha first preached his Gospel unto man....

যদিও শরীর তখন তাঁর অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছে,·· প্রায় শয্যাশায়ী তাঁর অবস্থা, তবু তিনি বেরিয়ে পড়লেন কাশীধাম দর্শনে। যে কাশী-বিশ্বনাথের দুয়ারে একদা কিঞ্চিন্ন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্বে—কত করুণ প্রার্থনা ও আকুতি জানিয়ে তাঁর মহীয়সী জননী তাঁকে কোলে পেয়েছিলেন, যে বীরেশ্বর শিবের বিশেষ অবতাররূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন বলে—তাঁর শৈশব নামকরণ হয়েছিল বীরেশ্বর,—আজ জীবনের শেষে সেই কাশীধামে কাশী-বিশ্বেশ্বরের শেষ দর্শনে তাঁর যাত্রা—নশ্বর দেহে তাঁর শেষ তীর্থভ্রমণ—বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।····

'It was a fit ending to all his wanderings'...

এই ভ্রমণ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন····

Buddhagaya, as it was now the last, had also been the first of the holy places he had set out to visit. And it had been in Benares some few years back,—when he was an unknown monk that he had said farewell to one, with the words,—Till that day when I fall on society like a thunderbolt, I shall visit this place no more.

আর কী অব্যর্থভাবেই না সে উক্তি আক্ষরিক সত্যে পরিণত হয়েছিল।

কাশীধাম থেকে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে—শীতের মধ্যভাগে একেবারে ভগ্নদেহ নিয়ে মঠে ফিরে এলেন স্বামীজী।

গুরুভ্রাতাগণ তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে অতিশয় শঙ্কিত হলেন, উৎকণ্ঠিত হলেন।

বিশেষ অনুরোধে তাঁকে সম্মত করিয়ে যথাসত্বর তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থাদি হল এবং চিকিৎসা চলতে থাকল। কিন্তু স্থায়ী কোন ফলই দেখা গেল না। শরীর তাঁর দিন দিনই মন্দ থেকে অধিকতর মন্দের দিকে চলল। আর ইচ্ছা-মৃত্যু, ধ্যানসিদ্ধ স্বামীজী—মহাপ্রস্থানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এক এক করে গুণে গুণে যেন অতিক্রম করতে লাগলেন। বিশেষ চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি সবই ক্রমশঃ তার বন্ধ হয়ে এল।

কিন্তু দেহ যতই অশক্ত, যতই অপটু হতে থাকল, - অন্তরের তপস্যাদীপ্তি ও আত্মিক মাহাত্ম্য ততই যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। কী তার স্নিগ্ধ মহিমা, কী তার অপরিমেয় পূত প্রভাব!

* * * *

ধীরে শীত অপগত হল, অপগত হল বসন্ত। তারপর গ্রীষ্মের প্রাখর্য অপসৃত করে পুঞ্জ পুঞ্জ সজল কালো মেঘ বাংলার নীলাভ ঈশান কোণে প্রথম দেখা দিল। মাঝে মাঝে বর্ষণপাতে মঠভূমি সিক্ত হতে সুরু করল, মাঝে মাঝে গঙ্গার বুকে একটানা বারিপাতের বিচিত্র শব্দ উঠতে লাগল—রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্। আর তাদেরই মধ্যে নিশ্চিন্ত নিরালায় বসে আত্মগতভাবে স্বামীজী শেষদিনের অপেক্ষা করতে লাগলেন

তথাপি, সে অবস্থাতেও কিন্তু পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ তাঁর ভাগ্যে ঘটল না, কর্মস্রোত একেবারে বন্ধ হল না। যথাসম্ভব শিষ্য ও শিষ্য-স্থানীয়দের শিক্ষা দিয়ে, সাহায্য করে—যথার্থ জিজ্ঞাসুদের আশীর্বাদ করে, প্রেরণা দিয়ে—অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আর নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যান-তন্ময়তার মধ্য দিয়েই তাঁর সময় অতিবাহিত হতে থাকল। এ দেহ দিয়ে কী আর হবে? অন্যের সেবায়ই এটা শেষ হয়ে যাক্।

What good is this body! Let it go in helping others!

—এ তাঁর এই সময়েরই একটি উক্তি। আবার এইকালে, অর্থাৎ জুন মাসের শেষদিকে, দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে—পার্শ্ববর্তী জনৈককে উদ্দেশ্য করে একদিন বললেন,…

মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি। একটা গভীর তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। আমি সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি।

A great Tapasya and meditation has come upon me and I am making ready for death....

একদিন মম দেহ যাবে,
হেথাকার কিছু নাহি রবে—
নিজমুখে এই মোর রহিল ঘোষণা।

তবু তন্দ্রাহীন, ক্লান্তিহীন,
ধরামাঝে রব চিরদিন—
পথভ্রষ্টে দেখাইব পথ,
প্রদানিব বিশুদ্ধ চেতনা।…

…এই যেন সে মনোভাবের নিগূঢ় অভিব্যক্তি।

* * * *

একদা, বহুকাল পূর্বে স্বামীজীর জীবন-কাল প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছিলেন—'ও যে দিন জানতে পারবে ও কে, সেদিন আর পৃথিবীতে থাকবে না, প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে দেহত্যাগ করে চলে যাবে।' সেই স্ব-স্বরূপ জ্ঞাত হয়ে, পরমধামে মহাপ্রস্থানের শেষদিন এইরূপেই এগিয়ে এসেছিল এবং যতই এগিয়ে এসেছিল মৃত্যুঞ্জয়ী বিবেকানন্দও ততই যেন অফুরন্ত আনন্দ এবং অব্যাহত শান্তির ঘনীভূত বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন সকলের কাছে।

এই সময়টিতে তিনি যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করতেন—তাঁর কর্ম সমাপ্ত হয়েছে। তদীয় মহান গুরুর যে মহতী যুগবার্তা প্রচার করবার সুকঠিন দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল—সে দায়িত্ব সম্যক উদ্‌যাপিত হয়েছে। তাই এই সময়…

Silently ignoring his world-wide fame he lived unostentatiously in the quiet monastery on the bank of the Ganges, sometimes playing the part of a Guru,… some times that of a father, sometimes even that of a school master…

এই ভাবেই কেটে গেল সে বিরাট, মহান জীবনের শেষকালের দিনগুলি। তারপর, একদা বহুদিন পূর্বে, যেদিন অধীনতার নিগড়-

বন্ধন ছিন্ন ক'রে স্বাধীনতার দীপ্ত-সূর্যকে অভিনন্দন জানিয়েছিল—তাঁর প্রথম কর্মকেন্দ্র আমেরিকা—সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-লেখায় লিখিত দিন, ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, সমাগত হল পৃথিবীর বুকে

সেদিন শুক্রবার। একাদশী তিথি। প্রাতঃকালে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঠাকুর ঘরে, সমস্ত দরজা, জানালা রুদ্ধ করে তিনি ধ্যান-নিমগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর, ধীরে ধীরে ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সর্বথা আত্ম-নিমগ্ন অবস্থায়। মুখে এক অপার্থিব স্বর্গীয় প্রশান্তি, কণ্ঠে অতি মৃদু ও অস্পষ্টস্বর ধ্বনিত হচ্ছে। আপন মনে গাইছেন সেই পুরাতন প্রিয় সঙ্গীত—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।

আবার, এই দিনটিতেই কোন এক সময় আপন মনে এ কথাও বলেছিলেন—'আজ আর একজন বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কি করে গেল!'...

অপরাহ্নের দিকে মঠের সীমানা ছাড়িয়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত একবার বেরিয়েও এলেন সেদিন। বাহ্যত সকলেরই মনে হল স্বামীজী অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। কিন্তু দিবাবসানের সাথে সাথেই লীলাবসানও যে সূচিত হবে সে আশঙ্কা কারো মনেই উদিত হল না। অথচ কঠোর বাস্তবে তাই সত্য হয়ে গেল।...

সে করুণ কাহিনীটিই এ পর্যায়ের শেষ কথা।

তখন সান্ধ্য-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা সবেমাত্র ধ্বনিত হচ্ছে দূরের মন্দিরে মন্দিরে। মঠের তরুণ সন্ন্যাসিগণ শান্ত হয়ে ধ্যানে বসেছেন। গঙ্গার বুকে তিমিরাবগুণ্ঠন ধীরে মন্থরগতিতে নেমে আসছে। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণটিতে নিজ কক্ষে ধ্যানসিদ্ধ স্বামীজীও ধ্যানে বসেছিলেন। সেবককে আদেশ করেছিলেন বাইরে অপেক্ষা করতে। বাতায়ন-পথে দেখা যাচ্ছিল দূরে গঙ্গার অপর তীরে দক্ষিণেশ্বরের অস্পষ্ট মন্দিরচূড়া –স্তব্ধ আকাশে, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি' মাথা উঁচু করে সে দাঁড়িয়ে আছে।

তাই, সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত সেই গুরুস্থানের দিকে মুখ করেই স্বামীজী ধ্যানে বসেছিলেন। হয়ত অন্তর-দেবতার পরম আহ্বান ঠিক সেই মুহূর্তে আর একবার শব্দিত হয়েছিল মর্মমূলে—'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুকগে, সংসারীর ভালোমন্দ সংস্কার সংসারীরা দেখুকগে –তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়'।...

আর মুহূর্তে প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে নশ্বর দেহত্যাগ করে তিনি অনন্তের বুকে মহাপ্রস্থান করেছিলেন। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আকাশের সূর্য অস্তাচলশায়ী হয়েছিল পশ্চিম দিগন্তে; বিচিত্র গৈরিক বর্ণে শোভান্বিত হয়েছিল দিগ্বলয়ের অন্তহীন পটভূমি, পৃথিবীর সূর্যসদৃশ বিবেকানন্দও তেমনি সমাধিযোগে প্রবেশ করেছিলেন মহাসমাধির মহাগভীরতায়। আর বুত্থিত হন নি।...

এ কালের প্রায় চারবৎসর পূর্বে মৃত্যুর পারিপার্শ্বিকতা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন—

'হিমালয়ের অতি নিভৃত বন-প্রদেশে একটি তুচ্ছ কাষ্ঠখণ্ডের উপর শুয়ে প্রতীক্ষা করব মৃত্যুর। পাদমূলে কোন স্বচ্ছ গিরি-নির্ঝরিণী শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গান্তরে অশ্রান্ত প্রবাহে গতিশীল থাকবে। শব্দ উঠবে

অবিশ্রাম—হর, হর ; হর, হর। আর আমি তারই মধ্যে মহানিদ্রার মহানীরবতায় প্রবেশ করব। আমার কাছে সেই হবে আদর্শ মৃত্যু।'

আজ চার বৎসর পরে, এক বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যায় মেঘাবৃত আকাশের নিচে পরিপূর্ণ গঙ্গার বীচি-বিক্ষোভের অনুচ্চ শব্দের মধ্যে অনাহত-নাদের উত্থান-পতনে যেন অকস্মাৎ ধ্বনিত হয়েছিল সেই হর, হর শব্দ এবং তাঁর মৃত্যু-কল্পনার পরিবেশের অনুরূপ এক পরিবেশেই যেন স্বেচ্ছায় তিনি মহাসমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন।

* * *

কোন্ জ্যোতির্লোক থেকে একদা এই মাটির পৃথিবীতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন—আবার কর্ম-অন্তে কোন্ লোকেই বা প্রস্থান করলেন তা কেউ জানল না···শুধু তাঁর নশ্বর দেহ—নশ্বর এই পৃথিবীর বুকে পড়ে রইল।

'সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর-মাঝারে,—
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর,
অমর্ত লোকের কোন্ বাক্যের অতীত, সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কর্ণে দিল আনি।'

* * * *

কালের পরিমাপে অতি অল্পদিন চল্লিশ বৎসর। চল্লিশ বৎসরও ঠিক নয়, তার চাইতেও কয়েক মাস কম। আবার এর মধ্যে তাঁর কর্ম-জীবনের পরিধি আরও কম—আট নয় বৎসরের মত বলা যায়। কিন্তু সে-কাল মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীর চিন্তাক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভারতের জাতীয়-জীবনের ভিত্তিমূলে, অভিনব সঞ্জীবনী রসধারা সিঞ্চন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হলেন সে চিন্তা-নায়ক মহামনীষী।

বহুযুগ, বহু মন্বন্তর পূর্বেকার সে-কথা। কালের কুজ্ঝটিতে আবৃতপ্রায় বিস্মৃত অতীতের সে-কাহিনী।

একদা তমসাতীরে ব্যাধহস্ত-নিহত ক্রৌঞ্চবিরহীর শোক দর্শনে—কবিগুরু বাল্মীকির কল্পলোকে যে দিন প্রথম স্ফূর্ত হয়েছিল ছন্দগাথা,

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতী সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চ নিধনাদেকমবোধী কাম মোহিতং।'

সেদিন—কোন্ মহাজীবনের উদ্দেশ্যে সে অপার্থিব শ্লোকরাশি উৎসৃষ্ট হবে—তা জানবার জন্য দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করেছিলেন কবিগুরু। বলেছিলেন,—

'সমগ্রারূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং।'

কোন্ একটিমাত্র নরকে আশ্রয় ক'রে সমগ্রা লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করেছেন? মর্তভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন নারদ—

'দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতং।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভি র্যো যুক্তো নরচন্দ্রমা।'

দেবতাদের মধ্যে নেই, স্বর্গধামে নেই···সর্বগুণসমন্বিত এমন পুরুষ এক নরলোকের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র ভিন্ন আর কোথাও নেই, কোন লোকে নেই।

কিন্তু কাব্যযুগের দূর অতীতের এই আখ্যায়িকা—সর্বাংশে সত্য কিনা, নিখুঁত বাস্তব ঘটনা কিনা আমরা জানি না।

তবে বিংশশতাব্দীর জাগ্রত বর্তমানে—এ যুগের মহাকবির ভাষায় প্রাচীন যুগের প্রশ্নটিকে যদি নূতন করে কেউ উত্থাপন করে, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—

—'বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক ;
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—'

তবে নিঃসংশয়ে, নিঃসন্দেহে আমরা বলব—সে নর-চন্দ্রমা পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দ।

সর্ব-বিপরীত গুণের এমন অপূর্ব সমাবেশ, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের এমন জ্বলন্ত, জীবন্ত বিগ্রহ,···

জ্ঞানের দীপ্তিতে ও ভক্তির কোমলতায় এমন মহীয়ান···

কর্মের কৌশলে ও আধ্যাত্মিক প্রতিভায়, তেজস্বিতায় ও স্নেহে, —ক্ষমায় ও বীর্যে—এমন পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধ জীবন জগৎ ইতিপূর্বে আর দেখে নাই, ভাবীকালেও দেখবে কিনা সন্দেহ। ধন্য সেই দেশ, যার বুকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ধন্য সেই মানবগোষ্ঠি, যে গোষ্ঠি সম-সাময়িক কালে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল। আর ধন্য, শতবার ধন্য সেই মুষ্টিমেয় নরনারী যাঁরা তাঁর পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করবার সুদুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিল।

'Blessed is the country in which he was born, blessed are they who lived in this earth at the same time and blessed, thrice blessed are the few who sat at his feet.

* * * *

একদা নিদ্রামগ্ন, বিগত-বিশ্বাস—অনড়, অচল জাতিকে জাগ্রত

করবার জন্য, কল্যাণকর্মে প্রবুদ্ধ করবার জন্য--আর তারই সঙ্গে হিংসামত্ত পৃথিবীতে—ভোগ-লোলুপ দানবীয় মদমত্ততার মধ্যে শান্তি ও আনন্দের অমৃতনিষেক সিঞ্চন করবার জন্য কোন্ সমরস জ্যোতির্ময় রাজ্য থেকে—এই মাটির পৃথিবীতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু তাঁরা জীবদ্দশায় একদা স্বয়ং তিনি একথা বলেছিলেন,—

এটা খুবই সম্ভব যে এই দেহের পরিধি ভঙ্গ করে, জীর্ণবস্ত্রের মত এই দেহটিকে ত্যাগ করে চলে যাবার প্রয়োজন একদিন আমি অনুভব করব। কিন্তু তাতে আমার কার্যপ্রবাহ কিছুমাত্র ব্যাহত হবে না। যতদিন পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ নিজের ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করতে না পারবে, যতদিন সে না উপলব্ধি করবে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'— ততদিনই অলক্ষ্য-লোক থেকে আমি তাদের উদ্দীপ্ত করতে, প্রবুদ্ধ করতে সচেষ্ট থাকব।

আশাভরা অন্তরে সেই দিব্য, অব্যর্থ আশ্বাসবাণী আজ আমরা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি।

তাঁর দেহত্যাগের পর কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী অতীত হয়েছে। জন্মকাল থেকে অতীত হয়েছে শত বৎসরেরও অধিক একটি কাল। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, 'পতন-অভ্যুদয়' কত 'বন্ধুর পন্থার' মধ্য দিয়ে—এই কালের মধ্যে অগ্রসর হয়েছে ভারতবর্ষ— উত্তীর্ণ হয়েছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষিত ভূমিতে।

সমগ্র মানব সমাজই বা কত দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে এইকালে। অসীম আকাশের বুকে অবাধ বিচরণ ক্ষমতা লাভ করে আজ সে গ্রহান্তরে পাদবিক্ষেপ করেছে। কিন্তু পুঞ্জীভূত কৃষ্ণমেঘে আজও আচ্ছন্ন দেখি তাদের ভাগ্যাকাশ। দ্বেষ-হিংসার কুজ্ঝটিকায় দিক্-চক্ররেখা দৃষ্টির অন্তরালে আজও দেখি লুক্কায়িত। আজও তাই, সেই পুণ্যশ্লোক মনীষীর প্রদীপ্ত স্মৃতির উদ্দেশ্যে ব্যথিত, ক্লিষ্ট

সমষ্টিপ্রাণ—আর্তরবে সেই অতীত দিনেরই মত যেন প্রার্থনা জানাচ্ছে।

হে আদিত্যবর্ণ মহান্ত পুরুষ,
হে সনাতন, স্বয়ম্প্রকাশ,
আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও।

জাতির একান্ত দুর্দিনে, মানবসমাজের ব্যাপক বিমূঢ়তার সংকটে যুগে যুগে যেমন তুমি আগমন করেছ—'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—আজও তেমনি আলোকের পথে, আলোকের রথে হোক তোমার শুভ-আবির্ভাব!

তোমার যে অক্ষয় পরম বাণী বিগত শতাব্দীর উষাকালে ভারতের ভাগ্যাকাশে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল, আজ পুনঃ তার সুগম্ভীর প্রতিধ্বনি শব্দিত হোক, মন্দ্রিত হোক।...

'দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বলে মনে হচ্ছে। মহাদুঃখের অবসান আসন্ন। প্রগাঢ় নিদ্রায় যারা এতদিন অভিভূত ছিল আজ তারা জাগ্রত হতে শুরু করেছে।...

ইতিহাসের কথা দূরে থাক, কিম্বদন্তী পর্যন্ত যে দূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করতে সক্ষম নয়—সেখান থেকে এক অপূর্ব বাণী যেন বায়ুতরঙ্গে ভেসে আসছে, শ্রুতিগোচর হচ্ছে তার অস্ফুটধ্বনি। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের অন্তহীন হিমালয়স্বরূপ আমাদের এই মাতৃভূমির প্রতিশৃঙ্গ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে-বাণী যেন মৃদু অথচ অব্যর্থ শব্দতরঙ্গে কোন্ রহস্যময় জগতের সংবাদ বহন করে নিয়ে আসছে। দিনে দিনে সে বাণী স্পষ্টতর ও গভীরতর বলে প্রতীত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসেও জীবনসঞ্চার হবে, নিদ্রালসতা সম্পূর্ণ অপসৃত হয়ে যাবে।

অন্ধ যে সে দেখতে পাচ্ছে না, দুর্বল-মস্তিষ্ক যে সে উপলব্ধি করতে পারছে না, কিন্তু আমাদের এই মাতৃভূমি যে গাঢ় নিদ্রা থেকে জাগরিত হচ্ছেন—তাতে আর সন্দেহ নেই।···আর এদেশ নিদ্রিত হবে না, আর কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না, কোন বহিঃশত্রু একে চেপে রাখতে সক্ষম হবে না।'

প্রত্যাসন্ন নবযুগে সূর্য-দেবতার প্রসন্ন আবির্ভাবে আবার পূর্ব দিগন্ত বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

প্রণাম, হে মহাজীবন, হে সর্ব, সর্বদিক থেকে সহস্রবার তোমাকে, প্রণাম করি।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্ব।····

তুমি,—

ভালবেসে দেশ সন্ন্যাসীবেশ
আপন অঙ্গে ধরিলে;
তরিতে নিঃস্বে অখিল বিশ্বে
বেদের বারতা কহিলে।
'মানুষই দেবতা,' এই যুগ-গাঁথা
গেয়ে গেলে নিরলস;
বিবেক-আনন্দ সেই হেতু নাম,
ইতিহাসে আছে লেখা।
মোরা আজি তাই, আকাশে পাঠাই
বন্দনা গীতি-রেখা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।